কাকলি

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল

''শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।''

– স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকাশক	ঃ	ড. শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
প্রধান সম্পাদক	ঃ	শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী
সম্পাদকমণ্ডলী	ঃ	১। শ্রী অরুণাভ চক্রবর্তী ২। শ্রীমতী চন্দনা চৌধুরী ৩। শ্রী গদাধর রুজ ৪। শ্রী বুদ্ধদেব সাহা ৫। শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৬। শ্রী জয়দেব কুণ্ডু ৭। শ্রী চঞ্চল রায় ৮। শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯। শ্রী রামকৃষ্ণ কর্মকার ১০। শ্রী চিন্ময় কুমার বিশ্বাস ১১। কাজী মহঃ আবুল হায়াত ১২। শ্রী ফাধনি মিস্ত্রি
ছাত্র সম্পাদক	ঃ	১। সৌরভ মুখার্জ্জী (দ্বাদশ শ্রেণী) ২। শুভজিৎ মুখার্জ্জী (দ্বাদশ শ্রেণী) ৩। সুরজ মিত্র (দশম শ্রেণী) ৪। নিয়ন সাহা (দশম শ্রেণী)
প্রচ্ছদ ও বিন্যাস	ঃ	শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী
আলোকচিত্র	ঃ	সৌজন্যে - শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী, শ্রী শুভ্রকমল হাজরা
পাদপূরণ চিত্র	ঃ	দেব সাহিত্য কুটীর
কারিগরী সহায়তা	ঃ	শ্রী চিন্ময় কুমার বিশ্বাস, শ্রী তন্ময় দে (শ্রী গণেশ অফসেট)

ফর্ম - ৪

১। পত্রিকা প্রকাশকের স্থান	ঃ	বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল
২। প্রকাশ সংখ্যা	ঃ	৫৬ তম
৩। প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	ঃ	ড. শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল
৪। মুদ্রকের নাম	ঃ	সদানন্দ প্রেস, বর্ধমান
৫। সম্পাদকমণ্ডলীর নাম, জাতীয়তা ও ঠিকানা	ঃ	১। শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ২। শ্রী অরুণাভ চক্রবর্তী, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৩। শ্রীমতী চন্দনা চৌধুরী, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৪। শ্রী গদাধর রুজ, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৫। শ্রী বুদ্ধদেব সাহা, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৬। শ্রী দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৭। শ্রী জয়দেব কুণ্ডু, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৮। শ্রী চঞ্চল রায়, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ৯। শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ১০। শ্রী রামকৃষ্ণ কর্মকার, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ১১। শ্রী চিন্ময় কুমার বিশ্বাস, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ১২। কাজী মহঃ আবুল হায়াত, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ১৩। শ্রী ফাধনি মিস্ত্রি, ভারতীয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল
৬। পত্রিকার স্বত্ত্বাধিকারী	ঃ	বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উপরিউক্ত বিবরণগুলি সত্য ও যথার্থ।

প্রকাশক

वेणु राजामणि
राष्ट्रपति के प्रेस सचिव
Venu Rajamony
Press Secretary to the President

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली -110004
President's Secretariat,
Rashtrapati Bhavan,
New Delhi - 110004

MESSAGE

The President of India, Shri Pranab Mukherjee, is happy to know that the Burdwan Municipal High School, Burdwan is bringing out its School Magazine 'Kakali'.

The President extends his warm greetings and felicitations to the Headmaster, staff and the students of the School and congratulates the School on the launch of the magazine.

R. V.

Press Secretary to the President

Tel. : +91-11-23016636 (Direct), 23015321 Extn 4322, Fax 23794498, E-mail:press.secy@rb.nic.in; presssecyrb@gmail.com

Dr Rabiranjan Chattopadhyay
Minister-In-Charge
Science & Technology and Biotechnology Depts.
Government of West Bengal
Bikash Bhawan
Kolkata - 700 091
Phone : (033) 2334-1443
Fax : (033) 2334-8074

ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন
কলকাতা - ৭০০ ০৯১
দূরভাষ নং : (০৩৩) ২৩৩৪-১৪৪৩
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৩৩৪-৮৪৭৪

No. 35/MIC/DST Date : 21.01.2013

Message

I am pleased to know that Burdwan Municipal High School is going to publish their school magazine, 'Kakali' shortly.

I wish the publication of the school magazine all success.

(Rabiranjan Chattopadhyay)

Headmaster,
Burdwan Municipal High School,
P.O. & Dist. Burdwan.

পুত্রের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠি

মাননীয় মহাশয়,

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন –এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি।

আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন – সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন, কিভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কিভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দেবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগেভাগেই এ কথা বুঝতে শেখে যারা পীড়নকারী তাদেরই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন।

আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশী সম্মানজনক। নিজের ওপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন, ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায় – হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার। সে যেন সবার কথা শোনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন ভালোটাই শুধু গ্রহন করে –এ শিক্ষাও তাকে দেবেন।

সে যেন শেখে দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই এ কথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদের সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েস থেকে সাবধান থাকে।

আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না, কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষাও দেবেন – নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

ইতি -
আপনার বিশ্বস্ত আব্রাহাম লিঙ্কন

Abm Lincoln

(সূত্র ঃ ইন্টারনেট)

শোকজ্ঞাপন

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের গৌরবের ঐতিহ্য গড়ে তোলেন ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। কালের নিয়মে তাঁরা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁদের অবদান থেকে যায় স্থায়ী হয়ে। আমরা আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করি যখন তাঁরা পৃথিবীর অঙ্গণ থেকে অবসর নেন। সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত হয়েছেন প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক নারায়ণ চৌধুরী, অমলেন্দু দত্ত, অমিয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষক গদাধর রক্ষিত, অনিল কুমার পাঁজা ও অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত হয়েছেন শিক্ষাকর্মী শিবনাথ ঝা। এই গুণী শিক্ষকদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি নিষ্ঠাবান শিক্ষাকর্মীর প্রতি।

অকালে বিদায় নিয়েছে আমাদের কয়েকজন প্রিয় ছাত্র অরিত্র ভট্টাচার্য, শুভ্রনীল সাঁতরা, দিব্যেন্দু চক্রবর্ত্তী। অসীম সম্ভাবনার এই বিনাশে আমরা ব্যথিত।

বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে আমরা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্থাপনা করায় বিশ্বাস করি। তাই সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষেরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মরণ করি। আমরা হারিয়েছি জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা মাইকেল জ্যাকসন, গজল সম্রাট মেহেদি হাসান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধনকারী পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের স্তম্ভ ভীমসেন যোশী ও পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীকে। বিনোদনের জগৎ হারিয়েছে প্রথম ভারতীয় সুপারস্টার রাজেশ খান্না, চির তরুন দেব আনন্দ, গায়ক-গীতিকার-সুরকার ভুপেন হাজারিকা, অজিত পাণ্ডে, অজয় দাস, চরিত্র অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রয়াত হয়েছেন তারকা চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, মহিলা শিল্পী শানু লাহিড়ী, গণেশ পাইন। ক্রীড়াজগৎ হারিয়েছে ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম শতরানকারী মুস্তাক আলি, বিদেশের মাটিতে বিজয়ী অধিনায়ক মনসুর আলি খান (পতৌদি), হকি তারকা লেসলি ক্লডিয়াস, ফুটবল তারকা শৈলেন মান্না, ক্রিকেট তারকা টনি গ্রেগকে। বিদায় নিয়েছেন অ্যাপল-এর জনক স্টিভ জোভস্, প্রকৃতিবিদ্ স্টিভ আরউইন, চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পনকারী নিল আর্মস্ট্রং। শিক্ষা ও মননের জগৎ হারিয়েছে অধ্যাপক পুরুষোত্তম লাল, ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মুরারী মোহন বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রীকে। লেখনী স্তব্ধ হয়েছে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক ইন্দিরা গোস্বামী, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ ও ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল, প্রাক্তন রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও জ্যোতি বসু। বিদায় নিয়েছেন বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামী রমারানী তা, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায়। এছাড়াও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁদের অবদানে পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের জন্য রইল শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আমরা স্মরণ করি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, সন্ত্রাসবাদী হামলা, নানা হিংসাত্মক ঘটনা, সামাজিক অবিচার ও হিংসার বলি সাধারণ মানুষকে। আমরা অভিবাদন করি দেশের সুরক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ বীর সেনানীদের। নমস্কার জানাই সাহসিনী ভারতকন্যাকে।

অভিনন্দন

ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জী মহাশয় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী মহাশয়া এবং লোকসভার প্রথম মহিলা অধ্যক্ষা শ্রীমতী মীরা কুমার মহাশয়াকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মহেন্দ্র সিংহ ধোনীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক T-20 বিশ্বকাপ জয় (২০০৭) ও একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় (২০১১) এবং উন্মুক্ত চাঁদ-এর নেতৃত্বে অনূর্দ্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় (২০১২) ভারতকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেজন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। অভিনন্দন জানাই শততম সেঞ্চুরীর মালিক ক্রিকেট যাদুকর শচীন রমেশ তেণ্ডুলকর ও মারণ ব্যাধি ক্যান্সার জয়ী যুবরাজ সিং-কে, তাঁদের প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করি। নেহরু কাপ ফুটবলে ভারতের পর পর তিনবার জয় (২০০৭, ২০০৯, ২০১২) ভারতীয় ফুটবলকে গৌরবান্বিত করেছে — প্রতিটি খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানাই।

লণ্ডন অলিম্পিকে (২০১২) রৌপ্যজয়ী সুশীল কুমার সিং (কুস্তি), রৌপ্যজয়ী বিজয় কুমার (শুটিং), ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা নেহওয়াল (ব্যাডমিন্টন), ব্রোঞ্জজয়ী মাংতে চুংনেই জাং মেরী কম (বক্সিং), ব্রোঞ্জজয়ী যোগেশ্বর দত্ (কুস্তি), ব্রোঞ্জজয়ী গগন নারাং (শুটিং) এবং ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে সোনা জয়ী অভিনব বিন্দ্রা (রাইফেল শুটিং) প্রত্যেকে ভারতের মুকুটে কয়েকটি রঙীন পালক সংযোজন করেছেন - আমরা গর্বিত। এছাড়াও দাবায় বিশ্বসেরা (২০১২) বিশ্বনাথন আনন্দ, ঝুলন গোস্বামী (প্রাক্তন দলনায়িকা, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল), দোলা ব্যানার্জী ও রাহুল ব্যানার্জী (তিরন্দাজী) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন - সকলকেই অভিনন্দন জানাই। চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত (২০১১) শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই।

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা আমেরিকায় পরপর ২ বার (২০০৮ ও ২০১২) রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই মায়ানমায়ের বিদ্রোহী জননেত্রী আউং সাং সুকী মহাশয়াকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য।

ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্পকলা, অভিযান, ক্রীড়াক্ষেত্রে যাঁরা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন - আমরা তাদের জন্য উচ্ছ্বসিত-আনন্দিত —সকলের জন্য থাকল অভিনন্দন।

সূচীপত্র

প্রধান শিক্ষকের কলম			পৃষ্ঠা - ১৬
The Column of the Secretary			পৃষ্ঠা - ১৮
বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদকের প্রতিবেদন			পৃষ্ঠা - ১৯
সম্পাদকীয়			পৃষ্ঠা - ২১

কবিতা

নেতাজী	মির্জা মুনযার মহম্মদ	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ২৩
আমাদের পরিবেশ	দেবজ্যোতি পাল	শ্রেণী নবম	পৃষ্ঠা - ২৩
ভারতীয় ক্রিকেট টিম	রন্তি হাজরা	শ্রেণী নবম	পৃষ্ঠা - ২৩
আমার রবীন্দ্রনাথ	সৌরদীপ হুই	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ২৪
জুতোর বাসনা	শুভজিৎ কোনার	শ্রেণী একাদশ	পৃষ্ঠা - ২৪
ফেরারী	সৌরভ মুখোপাধ্যায়	শ্রেণী দ্বাদশ	পৃষ্ঠা - ২৫
পরিবর্তন	অরিত্র মল্লিক	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ২৫
আমার স্কুল	জয়ন্ত হোড় (প্রাক্তন ছাত্র)		পৃষ্ঠা - ২৬
বড় হওয়ার মন্ত্র	দিলীপ কুমার ঘোষ প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক বিভাগ)		পৃষ্ঠা - ২৬
এক যে ছিল ছেলে	বুদ্ধদেব সাহা		পৃষ্ঠা - ২৭
ওদের শিশু দিবস	তাপস কুমার পাল (শিক্ষক, প্রাথমিক বিভাগ)		পৃষ্ঠা - ২৭
চরৈবেতি	দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক)		পৃষ্ঠা - ২৮
বাঁচতে দাও	নব্যেন্দু সাহা	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ২৮
ভাবনা	অভিজিৎ বসু (শিক্ষক)		পৃষ্ঠা - ২৯
শিক্ষক দিবসে (সনেট)	শৌর্য্য মিত্র	শ্রেণী একাদশ	পৃষ্ঠা - ২৯
ODE TO SPRING	Dipak Kumar Sikdar (Retired Teacher)		পৃষ্ঠা - ৩০
PARADISE LOST	Soumen Ganguly (Assistant Teacher)		পৃষ্ঠা - ৩০

ছোটগল্প

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না	অভিষেক সরকার	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৩১
ঘুম	গৌরব দাস	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৩১
ধৈর্য	দীপেশ দাস	শ্রেণী সপ্তম	পৃষ্ঠা - ৩২
আমার লাট্টু ঘুড়ি	সাওন মুখার্জী	শ্রেণী পঞ্চম	পৃষ্ঠা - ৩৩
আমার দেখা একটি করুণ ঘটনা	দেবজ্যোতি মিত্র	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৩৩
ফল চোর	সুমন্ত মন্ডল	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৩৪
গ্রামের অস্ফুট কান্না	সেখ মইনুল	শ্রেণী তৃতীয়	পৃষ্ঠা - ৩৪
পথের দিশা	সুরজ মিত্র	শ্রেণী অষ্টম	পৃষ্ঠা - ৩৫
উদ্ভাবন	সঞ্জীবন হাটী	শ্রেণী নবম	পৃষ্ঠা - ৩৬
কীট পতঙ্গের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক	দেবদীপ লাহা	শ্রেণী সপ্তম	পৃষ্ঠা - ৩৬
ভুতুড়ে বাড়ি	ঋষভদেব গায়েন	শ্রেণী - অষ্টম	পৃষ্ঠা - ৩৭

প্রবন্ধ

প্রয়াত শিক্ষক অনিলবাবু ও শিক্ষাকর্মী শিবুদা স্মরণে		স্বপন বিশ্বাস (শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র)	পৃষ্ঠা - ৩৮
ফেলে আসা ছড়াগুলি	দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক)		পৃষ্ঠা - ৩৯
গাজন	সৌরভ গাঙ্গুলী	শ্রেণী দ্বাদশ	পৃষ্ঠা - ৪২

কল্পবিজ্ঞান

রাহুল ও নীলাদ্রির সমান্তরাল বিশ্বে একটি অ্যাডভেঞ্চার	সোহম সেন	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৪৩
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য	দেবাঞ্জন রায়	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৪৫
অসম্ভব	চৌধুরী মহম্মদ রাকিব	শ্রেনী একাদশ	পৃষ্ঠা - ৪৬
আত্মত্যাগ	মননেন্দু দাস	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৪৮

ভ্রমণ কাহিনী

মরুভূমির দেশে	সৌরদ্বীপ রায়	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৪৯
একটি প্রাচীন উপাসনাস্থল - পুরীর শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির	ঋতব্রত ভট্টাচার্য	শ্রেণী নবম	পৃষ্ঠা - ৫২

আমার ভ্রমণ কাহিনী	অর্কদ্বীপ গুঁই	শ্রেণী পঞ্চম	পৃষ্ঠা - ৫৩
বেড়িয়ে এলাম কাশ্মীর	ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়	শ্রেণী চতুর্থ	পৃষ্ঠা - ৫৪
পাহাড়ের রানি ঃ সিমলা	সৌম্যজিত রায়	শ্রেণী নবম	পৃষ্ঠা - ৫৫
কাজিরাঙার জঙ্গলে এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা (সত্য ঘটনা অবলম্বনে)			
	মৈনাক মান্না	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৫৬
লাদাখের ডায়েরি	নভোনীল মজুমদার	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৫৮
হিমালয়ে কয়েকটা দিন	সিদ্ধার্থ ঘড়ুই	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৫৯
আমার ‘‘ভাইজাগ’’ ও ‘‘হায়দ্রাবাদ’’ ভ্রমণের স্মৃতিকথা			
	দীপ্তেন্দু পাল	শ্রেণী সপ্তম	পৃষ্ঠা - ৬০

প্রবন্ধ

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা	শুভ্রনীল রায়	শ্রেণী দশম	পৃষ্ঠা - ৬১
শতোত্তর রজত-জয়ন্তী সংগ্রহশালা ও কয়েকটি প্রত্নবস্তু		সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী (শিক্ষক)	পৃষ্ঠা - ৬২
এন.সি.সি. ও স্কাউট	চিন্ময় কুমার বিশ্বাস (স্কাউট মাস্টার)		পৃষ্ঠা - ৬৫
সুনয়নী দেবী	সংহিতা মুখোপাধ্যায় (পার্শ্ব-শিক্ষিকা)		পৃষ্ঠা - ৬৯
ব্রহ্মপুত্র	কৌশিক রায় (শিক্ষক)		পৃষ্ঠা - ৭৩
দু-একটি ছোট্ট ঘটনার সংকলন	শক্তিপদ মহাপাত্র (প্রাক্তন শিক্ষক)		পৃষ্ঠা - ৭৬
Reminiscence	S. K. Mukhejee		পৃষ্ঠা - ৭৯
Acharya P. C. Roy – The Pioneer of Indian School of Chemistry in India			
	Atri Mallick	Class - X	পৃষ্ঠা - ৮১
Opportunities and advantages of Low Lactose Milk in Our Daily Life.			
	Samir Kumar Samanta	Assistant Teacher	পৃষ্ঠা - ৮২
HIV Drugs : a RAY of Hope	Subrata Ghosh	Assistant Teacher	পৃষ্ঠা - ৮৪
What is Physics? Understanding the nature			
	Aniket Majumder	Class - X	পৃষ্ঠা - ৮৮

প্রধান শিক্ষকের কলম

বিদ্যালয়ের পত্রিকা হল পড়াশুনা, খেলাধূলা, সমাজের কাজে নিজেকে নিয়োগ এবং ছাত্রদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে অনুসৃত পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের এক লিখিত দর্পন। দীর্ঘদিন বাদে আমাদের বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন 'কাকলি' আবার নব-কলেবরে প্রকাশিত হল - এটা আনন্দের বিষয়। ছাত্রদের ঘন ঘন ইউনিট টেস্ট, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার লক্ষ্যে শিশুকাল থেকেই ইঁদুরদৌড়ে সামিল হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি, গৃহ পরিবেশে ও বিদ্যালয়ে নানাবিধ চাপ এবং বয়সযোগ্য বিনোদনের একান্ত অভাব আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের মননশীলতাকে সংকুচিত করে ফেলছে। তাই বোধ হয় বারে বারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েও উপযুক্ত সংখ্যক মৌলিক রচনা আজকাল জমা পড়ে না, যাও বা জমা পড়ে তার মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নকলনবিশী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নেহহস্তের স্পর্শ স্পষ্ট থাকে। এগুলি বাদ না দিলে আবার অন্য এক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তবুও ম্যাগাজিন কমিটির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে মৌলিক লেখাগুলি আমরা বেছে নিতে পেরেছি। ছাত্রদের রচনাগুলি শৈলীতে খুব পরিণত না হলেও এগুলির মধ্যে তাদের হৃদয় পরীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আছে স্বীকার করতেই হয়। মস্তিষ্কের কসরৎ -এর সঙ্গে প্রাণের আবেগ যুক্ত হলে এদের জন্য আগামী দিনে সাহিত্য জগতের সিংহদুয়ার খোলা থাকবে সে বিশ্বাস রাখি।

কাকলির সর্বশেষ সংস্করণের প্রকাশকাল আর আজকের মধ্যে প্রায় পাঁচ বৎসরের ফারাক। এতদিন সে স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির মতই দিনের আলো দেখার আকুতিতে অপেক্ষমান ছিল। আজ তার মুক্তি। এই দীর্ঘ সময়কালে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল এগিয়ে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে প্রাণোচ্ছলতার সাক্ষ্য রেখে রেখে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বছর নজর কাড়া কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও আই.আই.টি. জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মত পরীক্ষাগুলিতেও আমাদের ছাত্ররা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রদের এই সাফল্যের পশ্চাতে আছে পঠনপাঠনের মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের মেধা ও অধ্যবসায়ের যুগলবন্দী, বিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচনায় পরিচালন সমিতির ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। বিগত ২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে লটারী ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সব ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হচ্ছে তাদের অনেকেরই পড়াশুনার মান আশানুরূপ নয়। আমরা সজাগ আছি। এদের পড়াশুনার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগেও উন্নতমানের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে। আশা করি, মেধা ভিত্তিতে বাছাই করা ছাত্র না হলেও এখানে লটারী প্রথায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের সাফল্য কিছু কম হবে না। এটাই আমাদের গর্বের উত্তরাধিকার।

আমরা এই উত্তরাধিকার বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০১২ সালে রাজ্য সরকার আমাদের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ মহাশয়কে 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। শ্রী ঘোষের সম্মানে আমাদের বিদ্যালয়ও গৌরবান্বিত হয়েছে।

মানুষের শারীরিক বিকাশ ঠিক ঠিক না হলে বৌদ্ধিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে আছে শরীরচর্চা ও নানাপ্রকার খেলাধূলার আয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার ক্ষেত্রেও আমাদের ছাত্ররা জেলার মধ্যে অগ্রণী। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়াদপ্তরের অধীনে একটি দীর্ঘমেয়াদী অনাবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়, যার প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন শ্রী মৃণাল কান্তি চৌধুরী মহাশয়। প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার শ্রী চুণী গোস্বামী মহাশয়। এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অনূর্দ্ধ ১৪ বছরের ফুটবলাররা ২০১১ সালে ফুটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়। ২০১১-তেই রাজ্য বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে (অনূর্দ্ধ ১৭ বৎসর) আমাদের বাস্কেটদল রানার্স আপ ঐ বৎসর সি.এ.বি. আয়োজিত দাতু ফাৎকার স্কুল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপে আমাদের দল জেলা চ্যাম্পিয়ান; ২০১২-তে রানার্স আপ অন্যান্য খেলাধূলাতেও আমাদের ছাত্রদের কৃতিত্ব প্রদর্শন কোন নতুন ঘটনা নয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অতীতেও রাজ্য ও জাতীয় দলে খেলেছে ও নেতৃত্ব দিয়েছে। এখনও প্রায় প্রতিবছরই জেলা ও রাজ্য বাস্কেটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট দলে আমাদের খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পায়। শ্রী বনবিহারী যশ স্বেচ্ছায় তাঁর অনবদ্য প্রশিক্ষণ দিয়ে বাস্কেটবলের প্রতিভাগুলিকে গড়ে তুলছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধূলাতেও ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহন থাকায় আমাদের ছাত্রের সহৃদয় ক্রীড়ানুরাগী অভিভাবক ছোটনীলপুর আমবাগান নিবাসী শ্রী যোগেন্দ্র বর্মন মহাশয়, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা বর্মন এবং ভাই শ্রী তমাল বর্মন একত্রে প্রায় সাত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর বাস্কেটবল মাঠ করে দিয়েছেন। ফুটবল মাঠটি সংস্কারের জন্যও তিনি ষাট হাজার টাকা ও একটি ঘাস কাটার মেসিন দান করেছেন। শ্রী যোগেন্দ্র বর্মন যেভাবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিনের পর দিন মাঠের কাজ করিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত। বর্ধমান

নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সুদীপ কুমার সাহা বিনা পারিশ্রমিকে মাঠের নকসা করে দিয়েছেন ও মিস্ত্রীদের নিয়ে কাজ করিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রায় প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটিকে গাড়ী রাখার জন্য ব্যবহার করে। ফলে মাঠটির চিরকাল ভগ্নদশা। মাঠটির পুনঃসংস্কারের জন্য বর্ধমানের বিধায়ক তথা পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্যোগী হয়ে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বর্ধমান উন্নয়ন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে চার লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মাঠটির সংস্কারের কাজ করেছেন কোলকাতা নিবাসী শ্রী হরি নস্কর ও তাঁর সহযোগীরা। এই সংস্কারের কাজে পরামর্শ দিয়ে ও তদারকি করে সাহায্য করেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন (এবং মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের প্রাক্তন ফুটবলার) শ্রী দেবাশীষ কোনার মহাশয়। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ফুটবল প্রশিক্ষক শ্রী মৃণালকান্তি চৌধুরীর অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ সাধন মুখার্জী (বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী) এই স্কুলে তাঁর আদর্শ শিক্ষক রাজেন্দ্র প্রসাদ নাগ মহাশয়ের স্মৃতিতে সাত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে একটি কমিউনিটি হল (রাজেন্দ্র ভবন) নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও ডা. মুখার্জী ২০১১ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে দুজন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রের জন্য ঁ নন্দ কুমার মুখার্জী ভরণপোষণ বৃত্তি প্রদান করছেন। ডা. মুখার্জী তাঁর পিতাকে লেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি আমাদের বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় দান করেছেন। বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও অনুদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে হরিদ্বারের একটি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী দেবাশীষ অধিকারী (সন্ন্যাস আশ্রমের নাম দেবর্ষি মহারাজ) সম্প্রতি রাজেন্দ্র ভবনের সাউণ্ড সিস্টেমটি দান করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা স্মরণে রাখব। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়নে আমাদের লক্ষ্য ঃ (১) একটি তিনতলা বিল্ডিং নির্মাণ - যার একতলায় কম্পিউটার ক্লাসের আধুনিক সুযোগ থাকবে, (২) আমাদের স্কুলের গেটটির সংস্কার, (৩) রাজেন্দ্র ভবন হলটির সম্প্রসারণ, (৪) মিউজিয়ামের আধুনিকীকরণ, (৫) প্রাথমিক বিভাগের বিল্ডিংটির উল্লম্ব সম্প্রসারণ, (৬) মূল বিল্ডিংটির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, (৭) গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ প্রভৃতি। আশা করি, সহৃদয় মানুষের ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় একাজ সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হবে।

আগামী দিনে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার মান আরও উন্নত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করে শেষ করি।

জয়হিন্দ!

The Column of the Secretary

It gives me pleasure to pen a few words for the school magazine "Kakali" that started its journey carrying the torch of the academic as well as creative activities of the teachers and the taught. I am a new incumbent in the courtyard of knowledge in this school with an avowed goal of keeping up and enhancing a congenial atmosphere in this age-old institution of great repute only to help fulfill the aspiration of academic attainment of the pupils, to provide them with adequate facilities to flourish in the areas of co-curricular activities including games and sports. I seek cordial co-operation of all the staff, the members of the M.C. and the guardians to achieve this target. My thanks and best wishes to all the members of the Magazine sub-committee who have toiled hard to show the magazine the light of the day. Thanks,

Thakahari Ghosh
Secretary

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদকের প্রতিবেদন

বিদ্যালয়ের পত্রিকা একটি বিদ্যালয়ের মুকুর। এতে প্রতিফলিত হয় ছাত্রদের সৃষ্টিশীলতা, সৃজনক্ষমতা। ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সবই মূর্ত হয় বিদ্যালয় পত্রিকাতে। আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা 'কাকলি' পুনরায় প্রকাশিত করতে পেরে আমি পরিচালন সমিতির সম্পাদক হিসাবে গর্ববোধ করছি। 'কাকলি' আক্ষরিক অর্থেই 'একাকী গায়কের নয় তো গান'। তাই সকলের জ্ঞাতার্থে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছি।

আজকের সমাজের চারদিকেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলার ঢক্কানিনাদ। ভোগবাদ একেবারে সমাজকে গ্রাস করছে। বাজারে ভোগ্যপণ্যের অভাব নেই। উত্তর আধুনিক কালপর্বে একদিকে যেমন 'মহাআখ্যান' ভেঙে 'লঘু আখ্যান' জন্ম নিচ্ছে তেমনই আমাদের সনাতন ঐতিহ্য, রীতিনীতি সবই প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে পড়েছে। সবকিছুকেই পণ্যের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে লোভ, ভ্রষ্টাচার, বেড়েছে অসাম্য, তিক্ততা, বাড়ছে শোষণ যদিও সে তার রং বদলে ফেলেছে। আর এমনই এক দোলাচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আজকের ভারতীয় সমাজ। অর্থগত ক্ষমতায় পিছিয়ে পড়া ভারতীয় জনমানসের এক তৃতীয়াংশ মানুষের বাঁচার পথ খোঁজা আজ রাষ্ট্রের কাছে মস্ত চ্যালেঞ্জ। ফলত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে জনমানসকে সঠিক পথে চালনা করতে রাষ্ট্রযন্ত্র বদ্ধপরিকর। সরকারী বা সরকার অধিকৃত শিক্ষালয়ের পাশাপাশি এখন বেসরকারী বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে যাদের আর্থিক ক্ষমতা আছে তারাই গাঁটের কড়ি খরচ করে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ ও শহরতলির ভারতবর্ষ এখনও সরকার ও সরকার অধিকৃত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের এইসব বিদ্যালয়ের পরিচালনের ক্ষেত্রে আরও নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। আশা করি সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সঠিক মানুষ নির্মান করে 'আত্মবিচ্ছেদ' -এর পথ থেকে সরে আসতে পারব। বিশ্বাস রাখি 'এ পথে আলো জ্বেলে - এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে"।

বিদ্যালয় পত্রিকা সামগ্রিক ভাবে একটি বিদ্যালয়ের চরিত্রকাঠামোকে চিনিয়ে দেয়। বিদ্যালয় সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র। সেইক্ষেত্রে এখানে ছাত্রদের মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা গুরুত্ব পায়, সর্বোপরি নতুন কিছু করে শেখানোর কাজেও তাদের উৎসাহিত করা হয়। সেই কাজে আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকাটি যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখিয়েছে বলে আমি মনে করি। সুদূর অতীত থেকে এই বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের যে ধারা বহমান সেই সনাতনী ঐতিহ্য আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। আগামী দিনে এই পত্রিকা কলেবরে ও বৈচিত্র্যে আরও নতুন হয়ে উঠবে এই আশা রাখি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতিচর্চা বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন এটি হল 'কমলহীরের দ্যুতি' যা থেকে আলো ক্রমশ ঠিকরে পড়ে। আমাদের আশা এই দ্যুতি আগামী দিনে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। যাঁরা প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে এই জ্ঞানের আলো দিচ্ছেন সেইসব মানুষেরা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমি বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে কাছে পেয়েছি প্রকৃত শিক্ষাদরদী মানবিক খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীকে যাঁরা অহরহ বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মোদ্যোগের পিছনে সফল ভূমিকা রেখে চলেছেন। আশা করি বলব না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনেও তাঁরা এমনই সদর্থক ভূমিকা পালন করবেন। সর্বোপরি এই প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁরা বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনামের পথ আরও প্রশস্ত করবেন।

তবে এটা কথা না বললেই নয় শিক্ষার দ্বারা মনুষ্যত্ব গঠন করে জাগ্রত বিবেক নির্মাণে শিক্ষকের যেমন অবদান আছে, তেমনি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের দায়িত্বও কম নয়। শিক্ষার্থী যদি মানুষের মতো মানুষ হবার তাড়না বাড়ি থেকে নিয়ে আসে তাহলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই কাজ করা আরও অনেক সহজ হয়। একজন ছাত্র কতক্ষণ বা বিদ্যালয়ে থাকে! খুব বেশি হলে ৬ ঘন্টা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীর উপরে প্রভাব ফেলে অবশ্যই, তবুও পিতামাতার আচরণ, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক শিক্ষা তার উপর আরও ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং আপনার সন্তান কতটা বিদ্যালয়মুখী, কোন সংসর্গে সে মিলছে, বিদ্যালয়কে কতটা ভালোবাসতে পেরেছে বা ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ককে কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখছে তা আপনাদেরকেই হিসাব করে দেখতে হবে। যদি আপনারা সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঠিক সুপরামর্শ দেন তাহলে আমাদের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা আমাদের কাছে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই বিদ্যালয়ের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি হিতৈষীর কোন অভাব নেই। শুধুমাত্র যোগসূত্র বা মেলবন্ধনের কাজটুকু করতে পারলেই অনেকের আনুকূল্য পাওয়া যাবে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটিকে আরও আধুনিকতর করার জন্য 'বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ' (B.D.A.) যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা আপ্লুত। বর্ধমানের নীলপুর নিবাসী মাননীয় শ্রী যোগেন্দ্র বর্মন বাবুর উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়ের বাস্কেট বলের মাঠ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে স্বর্ণপদক দিয়ে উৎসাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন মাননীয় লক্ষ্মী নায়েক বাবু। সেই সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকেও সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে স্বর্ণপদক দিয়ে উৎসাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন মাননীয় সন্তোষ সাহা শিকদার মহাশয়। তাঁকে ধন্যবাদ

জানাই। ২০১১ সাল থেকে মাননীয় ডাঃ সাধন মুখার্জীর অর্থানুকূল্যে দুঃস্থ মেধাবী একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই কর্মোদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সাংসদ তহবিল থেকে যে অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে তা দিয়ে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে। এছাড়াও ভলিবল মাঠ, ক্রিকেটের পিচ নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবনের বহিরঙ্গের রঙ, বিদ্যালয়ের মূল প্রবেশদ্বার সংস্কার ও ঐতিহ্যবাহী রাজেন্দ্রভবনটি বাতানুকূল করে তোলার জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজেন্দ্র ভবনের শব্দযন্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বর্ধমান নিবাসী মাননীয় দেবাশীষ অধিকারী। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি বলতে হয় আমাদের পরিচালন সমিতির সদস্যদের কথা যাঁরা বিদ্যালয় ইস্যুতে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর বলতে হবে প্রাথমিক বিভাগের কথা যাঁরা আপাত ক্ষুদ্রদের আগামী দিনের বনস্পতিতে পরিণত করার কাজে সতত সামিল থেকেছেন এবং থাকবেনও। আমরা আমাদের প্রাথমিক বিভাগের পঠনপাঠন নিয়ে গর্ব অনুভব করি। ধন্যবাদ জানাই সর্বশিক্ষা মিশনকে যারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উন্নয়নের ধারাকে বহমান রেখেছেন।

সর্বোপরি বিদ্যালয়ে নতুন সংযোজিত 'মিউজিয়াম' ও 'মিড ডে মিল' প্রকল্পের কথা বলতে হয়। যে কোনো ভালো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তার বর্তমান ছাত্রদের কাছে অনেককিছু দাবি করতে পারে। আমাদের বিদ্যালয়ে এই পথটি সুগম করেছে মিউজিয়ামটি। সে সম্পূর্ণ অতীতকে তুলে এনেছে বর্তমানের সামনে, বর্তমানকে বলতে বাধ্য করিয়েছে 'হে অতীত কথা কও', — যার বলে দেওয়া রাস্তা দিয়ে আজকের নতুন প্রজন্ম তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে, আধুনিক হবে। কেননা ঐতিহ্য আর প্রগতির মেলবন্ধনই যথার্থ আধুনিকতার জন্ম দেয়। এই মিউজিয়ামটির সাথে জড়িত সব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং এটির পূর্ণতা দানে সবশ্রেণির মানুষের সাহায্য কাম্য। আর বলতে হয় মিড-ডে মিল — প্রকল্পের কথা — যে প্রকল্প এতদিনকার ভারতীয় সমাজের 'জল চল - জল অচল' এই বায়বীয় অথচ কঠিন শ্রেণিবিভাগকে মুছে ফেলে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটা নতুন প্রজন্ম তৈরী হবে যারা 'জাতের নামে বজ্জাতি' আর সহ্য করবে না। তৈরী হবে একটা নতুন ভারতবর্ষ। এই বৃহৎ কর্মে যুক্ত সব ধরণের মানুষকে আমি সাধুবাদ জানাই।

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাহিদা অনুসারে বদলাতে হয়। সমাজের চাহিদা পূরণে, রাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি আমরা। কেবলমাত্র আত্মমুখী শিক্ষা নয়, সমাজমুখী শিক্ষা স্থাপনের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে যোগ দিতে আসুন আমরা সবাই এগিয়ে চলি। উত্তর আধুনিক সময়পর্বের এই ভেঙে যাওয়া, ঐতিহ্যচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই দাবি নিয়ে যেন যেতে পারি -

''আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'' (শঙ্খ ঘোষ)

সেখ নাজিবর রহমান
সম্পাদক

সম্পাদকীয়

সমাজবৃক্ষের অগ্রমুকুল হল ছাত্রসমাজ। তারাই বিকশিত হয়ে হয় পত্র শাখা ফুল ও ফলে। সমাজ লাভ করে অগ্রগতি। এই কিশলয়ের বিকাশের এক ক্ষেত্র হল সৃজনশীল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন হল সেই মনন চর্চার দর্পন।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ম্যাগাজিন 'কাকলি'র ৫৬ তম সংখ্যা অবশেষে প্রকাশিত হল। বিগত সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর কেটে গেছে ছয় ছয়টি বছর। ছাত্ররা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বিদ্যালয় ত্যাগ করে প্রবেশ করেছে উচ্চতর শিক্ষার প্রাঙ্গণে। তাদের রচনাকালের শ্রেণী অপরিবর্তিত রাখা হল সঙ্গত কারণেই। যেখানে এক বৎসর অন্তর প্রকাশিত হওয়া রীতি, সেখানে এই দীর্ঘ বিরতি সত্যিই অস্বস্তিকর। এরজন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তবে হয়তো এর একটা সদর্থক দিকও আছে। বিগত ছয় বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে যাচাই করবার অবকাশ মিলেছে ঘটনা চক্রে। বিগত অর্ধযুগের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে তথা আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলে পরিবর্তন ঘটে চলেছে দ্রুতবেগে। এই সময়ে আরও বন ধ্বংস হয়েছে, বুজে গেছে জলাভূমি। অবলুপ্ত হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণী। বিপন্নতর হয়েছে বাঘ, হাতি, সিংহ, গণ্ডার ও আরও প্রাণী। শহর আগ্রাসন চালিয়েছে কৃষিজমিতে, আরও বহুতল ফ্ল্যাট, শপিং মল পাল্টে দিচ্ছে আকাশরেখা, রাস্তায় আরও গাড়ি, আরও যানজট, আরও ভিড়, বাতাসে আরও দূষণ, জলাভূমিতে প্লাস্টিক, আরও মোবাইল, আরও কম্পিউটার, আরও আরও অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাস। আমরা দেখেছি ২৬/১১-র দুঃস্বপ্ন, মঙ্গলে মহাকাশ যান, চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি, অলিম্পিকে অভূতপূর্ব ছয়টি পদক, সচিন তেণ্ডুলকরের ইতিহাস রচনা, সম্প্রতি কর্ণেল লক্ষ্মী সায়গল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও রবিশঙ্কর, গণেশ পাইন, ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রয়াণ ও তজ্জনিত শূণ্যতা। দূষণ দারিদ্র্য নিষ্ঠুরতা ও উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও শান্তি, বিতর্ক ও স্বীকৃতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা মিলে চলেছে কালপ্রবাহ।

এরই মধ্যে আমাদের বিদ্যালয় তার গৌরবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। ২০০৮ সালে সাড়ম্বরে পালিত হল ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব। বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষক এবং অতীতের কৃতী ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলন বিন্দু এই বিদ্যালয় তার গৌরবের ইতিহাসকে নতুন করে অনুভব করল। তৈরি হল এক প্রাক্তন ছাত্রের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নতুন প্রেক্ষাগৃহ রাজেন্দ্র ভবন। প্রাক্তন ছাত্রদের বদান্যতায় গড়ে উঠল শতোত্তর রজত জয়ন্তী সংগ্রহশালা। নির্মিত হল বিদ্যালয়ের বিষয়ে তথ্যচিত্র। সরকারী অনুদানে সবুজ হয়ে উঠেছে খেলার মাঠ। নির্মিত হয়েছে বাস্কেটবল খেলার মাঠ এক সহৃদয় পরিবারের কল্যাণে। বিদ্যালয়ের গৌরবের মুকুট নতুন নতুন রত্নের বিভায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্রমাগত সাফল্যের কারণে।

কিন্তু বিপরীত দিকে অত্যধিক পরীক্ষার চাপে বিপর্যস্ত ছাত্রকুল যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণের সময় করে উঠতে পারছে না তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। যেটুকু অবসর মেলে সেটুকুও ব্যয় হয়ে যায় কম্পিউটার গেম ও মোবাইল ফোনের ফাঁদে পড়ে। এই প্রবণতা উদ্বেগ বাড়ায় ছাড়া কমায় না। শরীর চর্চার অভাব, মননশীল সৃজনমূলক কর্মে অনীহা, চটুল সংস্কৃতির চর্চা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ, আচরণে শীলের অভাব - সব কিছু মিলে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে যার কুফল পরবর্তী দিনগুলিকে যথেষ্ট উদ্বেগজনক করে তুলবে। এক শ্রেণীর অহংবোধযুক্ত অভিভাবকের বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের প্রতি অনাস্থা ও বিরূপ মনোভাব ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটাচ্ছে। শিক্ষার ভিত্তিভূমি হয়ে উঠছে দুর্বল ও বিপন্ন।

এই পরিস্থিতির ছায়াপাত ঘটে ম্যাগাজিনে। বারংবার লেখা দেবার বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত মানের রচনা জমা পড়ে না। পরীক্ষার চাপের অজুহাত চিরন্তন। ইউনিট টেস্টের চক্রে মৌলিক পঠন পাঠন চিন্তন এখন ব্রাত্য। এক শ্রেণীর অভিভাবক তাঁর সন্তানদের নিরুৎসাহিতও করেন যদি না পুরস্কার পাওয়া কিংবা প্রকাশিত হবার একশো ভাগ আশ্বাস পাওয়া যায়।

এই পাটোয়ারী বুদ্ধি কখনই সৃজনশীলতার পোষক নয় এবং সৃজনশীলতা ভিন্ন কখনও সাফল্য আসে না। আবার চটজলদি সাফল্যের স্বাদ পেতে অসদুপায় অবলম্বনও হয়ে থাকে। সম্পাদকের সতর্ক ছাঁকনি এড়িয়ে তা কখনও কখনও ছাপা হয়ে প্রকাশনাকে কলঙ্কিত করে থাকে। 'কাকলি' প্রকাশে বিলম্ব হবার পেছনে এই কারণগুলিই কাজ করেছে।

যুগের দাবীতে ছাত্র অভিভাবককূলের উজানযাত্রা ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের দিকে। বাংলা মাধ্যম স্কুলে এখন ভাটার টান। ছাত্রবাছাই এখন ভাগ্যদেবীর হাতে। এমতাবস্থায় মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল তার মেধা ও মনন ধারা কতখানি বজায় রাখতে পারবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। তবে শিক্ষককূল যে তাঁদের যথাসাধ্য প্রয়াস দেবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এই ত্রয়ীর সমন্বয়ে যে গৌরবের পরম্পরা গড়ে উঠেছে, আগামী দিনেও তা বজায় থাকবে, মেধা মনন চর্চার প্রতিফলন ঘটবে 'কাকলি'র আগামী প্রকাশনাগুলিতেও — এই আশা রেখে বর্তমান সংখ্যাটিকে ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

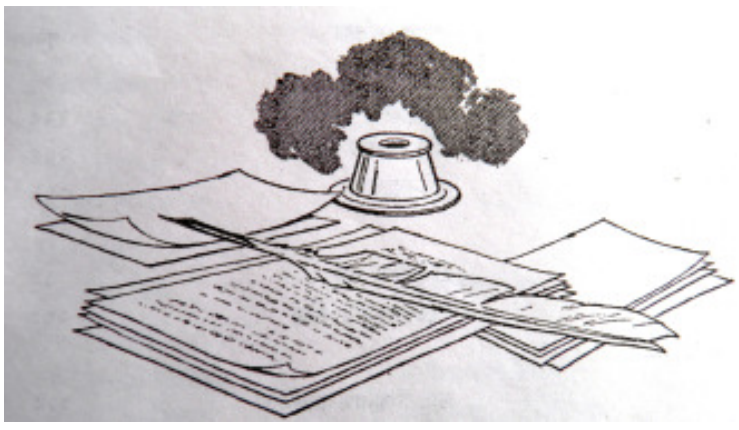

''মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মানি তানি সেবিতব্যানি, - নো ইতরানি।''
— উপনিষদ

কবিতা

নেতাজী

মির্জা মুনযার মহম্মদ
শ্রেণী চতুর্থ

নেতাজী মোদের লহ নমস্কার।
ভারত মাতারে করিলে স্বাধীন,
ঘোচালে পরাধীনতার অন্ধকার।
নেতাজী মোদের লহ নমস্কার।।
২৩ শে জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে
জন্ম নিলে তুমি মাতার কোলে।
ধারণ করিলে কাবুলীর বেশ
পাড়ি দিলে তুমি সুদূর বিদেশ।
ত্যজিলে দেশ, হইলে ফৌজি
আজাদ হিন্দ্ সেনা ডাকিল নেতাজী
ইংরাজ হতে ছিনিলে স্বাধীনতা সূর্য -
বিশ্ব দেখিল তোমার শৌর্য - বীর্য।
হয়তো তুমি এ ধরায় বেঁচে নেই।
তবু বেঁচে আছ আমাদের হৃদয়েই।

আমাদের পরিবেশ

দেবজ্যোতি পাল
শ্রেণী নবম

রাতের বেলা পাখিরা সব
জানিনা কী করে
সকাল হলে তারা সবাই
আকাশ জুড়ে ওড়ে।
চারিদিকে নীল জল
বয়ে যায় কল কল।
মেঘ ভাসে আকাশেতে
গাছ দোলে বাতাসেতে।
কী সুন্দর এই পরিবেশ!
লাগে আমার ভালো বেশ।

ভারতীয় ক্রিকেট টিম

রন্তি হাজরা
শ্রেণী নবম

দু'বল খেলেই যিনি মাঠ করেন ত্যাগ,
তিনি হলেন ভারতের বীরেন্দ্র সেহবাগ।
যার শটে বন্ধ হয় বোলারের বুলি,
তিনি হলেন ভারতের সৌরভ গাঙ্গুলি।
ব্যাট হাতে যিনি সত্যিকারের বীর,
তিনি হলেন ভারতের রাহুল দ্রাবিড়।
রানের জন্য যাকে একান্ত দরকার,
তিনি হলেন ভারতের শচীন তেন্ডুলকার।
যাঁকে আউট করাই কঠিন কাজ,
তিনি হলেন ভারতের সিংহ যুবরাজ।
ক্রিজে নেমে যিনি আর রান করতে চান না,
তিনি হলেন ভারতের সুরেশ রায়না।
রানের জন্য যিনি এখন চোখের মণি,
তিনি হলেন ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি।
বল হাতে যিনি স্পিনের কিং,
তিনি হলেন ভারতের হরভজন সিং।

''সাহস অবলম্বন কর, নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর,
মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর।''

—বিবেকানন্দ

আমার রবীন্দ্রনাথ

সৌরদীপ হুই
শ্রেণী দশম

প্রাণের ঠাকুর আছে প্রাণে
হৃদয় বীণার নীরব গানে
সেই গানেরই মধুর সুরে
আছো আমার এ মন জুড়ে।
চাই গো আমি, এ সুর যেন নিত্য বাজে আমার কানে।
দুঃখ যখন নিভায় বাতি
রয় নাগো কেউ যেদিন সাথী
দিও আমার তাপ ঘুচায়ে
আপন হাতে চোখ মুছায়ে
তোমরা স্নেহের আলোয় ঘুচাও, মোর জীবনের আঁধার রাতি
সবুজ শাখায় সুখের দিনে,
যে ফুল ফোটে হৃদয় বনে
সেই সে ফুলের গন্ধে মিশে
তোমার স্মৃতি ওঠে ভেসে
এই স্মৃতিটাই থাকুক সদা, দুঃখে সুখে আমার মনে।
কে বলে গো নেই তুমি হায়
প্রাণের মাঝে দেখি তোমায়;
হৃদয় পটে ওগো কবি,
নিত্য আঁকি তোমার ছবি,
জীবন পথে তোমারই নাম, লিখে মোর মনের খাতায়।

জুতোর বাসনা

শুভজিৎ কোনার
শ্রেণী একাদশ

‘মোদের দাবি মানতে হবে’, বলল জুতোর দল
দেখছ নাকি পায়ের তলে ফেলছি চোখের জল?
অতীত হতেই যাতনা সই, সইব কত আর
বেদনারই শেষ সীমানায় অশ্রু পারাবার।
যাচ্ছো যেথায় যখন খুশী মোদের ঘাড়ে চড়ি,
রাখছো বেঁধে পায়ের তলে বুক ফেটে যে মরি,
মোদের ব্যথা রাখছো ঢেকে মিথ্যা পালিশ করে,
যাচ্ছি ফেটে হোঁচট খেয়ে পথের ধূলায় ঘুরে
রাখব না আর বদ্ধ জীবন বদ্ধ মোদের যন্ত্রণায়
জুতোর জুতো পড়বে গালে আন্দোলনের মন্ত্রণায়।
যুগান্তরের ডাক দিয়েছি ক্ষুদ্র জুতোর দলে,
লাঞ্ছনা আর সইবো নাকো সবার চরণতলে
গুপ্ত ব্যথায় উঠছে ফুলে মোদের রক্ত শিরা
দেখবে এবার মোদের সাথে জুটছে বিদ্রোহীরা।

‘‘জীবনের সব কথা নির্ভয়ে লিখবে।’’

— টলস্টয়

ফেরারী

সৌরভ মুখোপাধ্যায়
শ্রেণী দ্বাদশ

কোনো এক অস্পষ্ট অস্বচ্ছ ভোরে-
পিঠে ব্যাগ নিয়ে নেমেছিলাম ইউক্যালিপটাসে মোড়া
নির্জন কালো পিচ রাস্তায়।।
এক ঝাঁক ভোরের কুয়াশা মিশেছিল আমার চুলে আর চোখের পাতায়
নিস্তব্ধ রাস্তায় শুকনো পাতার শব্দে ঘুমঘুম চোখে তাকিয়েছিল একটা কোকিল।
এরপর কাছের মানুষদের এক এক করে দূরে সরিয়ে -
আত্মগোপন করেছি ইঁটকাঠ কংক্রিটের এই ব্যস্ততার শহরে।
অনেকগুলো বছর কেটে গেছে
আজ আমার বসার ঘরের ধূসর দেওয়ালে
টুকরো টুকরো ছবি ভেসে ওঠে-
আমার ছেলেবেলা, একতলা প্রাইমারি স্কুল, সেই সাবেকী আমলের দুর্গা পুজো
আর আমার মা।।
একটু একটু করে আমার অক্ষমতার কোকেন - এ
অবশ হয়ে যায় আমার ধমনী, শিরা আর মস্তিষ্ক।
সেদিনের দুচোখ ভরা রঙীন স্বপ্নগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
আর সেই পুড়ে যাওয়া কালো কার্বনের উপর ঝরে পড়া
আমার দুফোঁটা চোখের জল তোমার কথা ভাবছে মা।
আজ আমার একরাশ চিন্তা আছে
আর আছে কয়েকটা বিষণ্ণ দুপুর
তোমার নরম হাতের স্নিগ্ধ ছোঁওয়া নেই
তোমার ঐ ফ্রেম বদ্ধ পৃথিবীর ক্যানভাস ছেড়ে একবার
এসো না মা!
আমরা প্রাণহীন শহরের এক চিলতে অন্ধকার বাড়িতে ...

শিল্পী ঃ পাবলো পিকাসো

পরিবর্তন

অরিত্র মল্লিক
শ্রেণী দশম

স্বচ্ছ সরোবর-
যে দিকে তাকাই
মুক্ত আকাশ, শান্ত বাতাস।
ধূধূ তেপান্তর-
একপাশে রয়েছে এক মস্ত বড় বিল,
রোদে জলে বারে বারে করে ঝিল্‌মল্‌।
নীল-লাল-সাদা পদ্মের গোছা এক রাশ,
প্রাণ মাতানো মধুর গন্ধে কাঁপায় বাতাস।
ছল-ছল-ছলাৎ ছল নীল সরোবর।
পায়ে হেঁটে পার হতে হয় ঐ তেপান্তরের মাঠ,
সন্ধ্যা নামলে ওত পাতে রঘু - বিশু ডাকাত।
শূন্যতার মাঝখানে নাই যে কোনো বাড়ি ঘর,
জনহীন প্রান্তরে মানুষ করে না বসবাস।
এল যন্ত্রের যুগ, এল যন্ত্রমানব,
বদলে দিল রঙীন গল্পের রূপকথার চমক।
সরে গেল রূপকথার রাজকন্যার পল্লবিত বিকাশ,
দখল করল যন্ত্রদানবের উদ্ধত - উন্মত্ত নাভিশ্বাস।
ধীরে ধীরে বদলে গেল পার্শ্বিক সকল দৃশ্য,
ঝাঁকামুটে - রোজনামচা - গরীব - মজুর নিঃস্ব।
শুরু হল ইট পাথরের জয়-
স্বল্প দিনে নেইকো তার ক্ষয়।
আকাশ কুঁড়ে মেঘ শিখরে
গড়ছে নিত্য ইট - পাথরে,
সারি সারি অট্টালিকা ঘর;
মুছে যায় রূপকথার ধূ ধূ তেপান্তর।

''প্রতিদ্বন্দ্বী আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম ও অধর্ম''
— জগদীশ চন্দ্র বসু

আমার স্কুল

জয়ন্ত হোড় (প্রাক্তন ছাত্র)

আমার স্কুল,
বর্ধমান নিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল
আমার অতি প্রিয়

শৈশবে - স্মৃতি যে স্থায়ীভাবে
বাঁধা রয়েছে ওখানে।

এত বছর পরেও
স্কুলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে
কেমন যেন মনে হয়
টিফিনের সময় ছুটছি আমি;

সবাই মিলে চাঁদা তুলে বল কিনে
স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা,
জমত খুব।

স্কুলে দোলে এখনও সেই কল
জল খাওয়ায় আমাকে, যত্ন করে।

স্কুলের ঘন্টা - ধ্বনির অনুরণন
শিহরণ জাগায় দেহে ও মনে

নোটিশ বোর্ডের দিকে তাকালেই
অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে মনে।
স্কুলের বেঞ্চগুলো কাছে ডেকে বলে,
দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো।

চেয়ারের দিকে চোখ পড়তেই
ভেসে ওঠে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মুখ।
কানে বাজে তাঁদের সস্নেহ
সতর্কবাণী-
'সময় নষ্ট কোরো না, মনে রেখো
চিরদিন তোমরা ছোটো থাকবে না'।

সত্যি সত্যি ছোট থাকলামও না।
হয়ে গেলাম প্রাক্তন ছাত্র।
সঙ্গী-সাথীদের দেখিয়ে বলি-
এই দ্যাখো, এটা আমার স্কুল।

ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে-
আমার স্কুল, এটা আমার স্কুল
আমার প্রিয়
বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল।

বড় হওয়ার মন্ত্র

দিলীপ কুমার ঘোষ
প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক বিভাগ)

ছোট থেকেই জীবনটাকে
আলোর পথে গড়তে হয়।
জগৎটাকে জানতে হলে
লেখা পড়া করতে হয়।
গুরুজনের কথা মেনেই
সকল সময় চলতে হয়।
যতই আসুক বাধা, তবু-
মিথ্যাচারকে দলতে হয়।
সবাই যে দিন মিথ্যে ছেড়ে
সত্যবাদের ধরবে হাত,
দুঃখ আঁধার বিদায় নেবে
আসবে আলোর সুখ প্রভাত।
ছোট বলার প্রচেষ্টাতেই
গড়বে জীবন, জাগবে দেশ,
থাকবে সবাই মিলে মিশে
থাকবে নাকো আঁধার রেশ।

উডকাট, শিল্পী ঃ হরেন দাস

"I realize, small aim is a crime."
– A.P.J. Abdul Kalam

এক যে ছিল ছেলে

বুদ্ধদেব সাহা

মাঠের সীমানা পেরিয়ে যেখানে পথ হয় আঁকা বাঁকা।
স্নিতধা মধুর ডানায় শুভ্ররঙে মধুমাখা।
শীতল শিশিরে ভরানো সোনার টুকরো রয়েছে ফুলের পাশে,
দেহতত্ত্বের গানে যেথা বাউলের সুরে ভোর নেমে আসে।
সেই গ্রামেরই আনাচে কানাচে ডানপিটে এক, নেই আর কোন ভয়,
হরবোলা ডেকে দুষ্টের সাথে মিষ্ট ভাবে যার খুবই পরিচয়।
ছোটাছুটি করে শিশুদের নিয়ে খেলে যেন এক চিল,
সকলের মন - মন্দিরে যেন সে রাখে সাথী সাথে মিল।
সাদা মন নিয়ে কলার ভেলাটা নিয়ে যায় দীঘির ঘাটে,
বেনু বনে যায় বাবুই তাড়ায় ছোটাছুটি করে শূন্য মাঠে।
মাঠে ঘাটে হাটে তিনবেলা কাটে নয়কো সে ঘর কুনো,
হোক সে ভীষণ দুষ্টু তবু পড়ায় ফাঁকি সে দেয়নি কখনো।
রাত গভীর হতে ছুটে আসে যত বুনো নিশাচর পাখি,
ভাট পিটালীর জঙ্গল থেকে ওঠে শিয়ালের হাঁকাহাঁকি।
দুয়ারে দুয়ারে ঘুমায় ছেলেটা খড় কুটোর বিছানাতে,
কল্পনার রঙে রামধনু আঁকে মনের মাধুরীর সাথে।
জলে ভিজে রোদে ঘুরে ফেরে, তবু হয়নিকো জ্বরটর,
হোগলার ক্ষেতে খেলায় মাতে, নেই কোন ভয় ডর।
ভয় কারে কয় জানে না কখনো, করেনি মাথা নত,
ভয় দেখালে, গল্প শোনালে হয়ে থাকে সে আনত।

ওদের শিশু দিবস

তাপস কুমার পাল
(শিক্ষক, প্রাথমিক বিভাগ)

আবার এসেছে ১৪ই নভেম্বর
শোনো ছোট্ট বন্ধুরা -
'আজ তোমাদের খুশির দিন'
'আজ তোমাদের খোলা দিনের
মুক্ত বাতাসের দিন'
একি! তুমি এখনো পাথর ভাঙছো?
নরম হাত ফোস্কায় ছিন্ন হয়ে কঠিন।
তুমি জানো না আজ তোমাদের দিন?
এ কি ! তোমার পিঠে এখনো বোঝা।
আবর্জনার মাঝে নিজেও আবর্জনা!
তুমিও জানো না বুঝি আজ শিশুদিবস?
এ কি! এখনো তুমি বাসন মেজে চলেছো?
মাথার ঘামে সিক্ত কচি মুখ,
তুমিও বোধহয় জানো না আজ কত তারিখ?
এ কি! এঁটো চায়ের গ্লাস নিয়ে এখনো!
সকাল সন্ধে শুধু আধপেটে কাজ।
তুমিও ওদের মতো জানো না আজ কি আনন্দের দিন তোমাদের
তোমরা সবাই দেখো —
মঞ্চ ফুলে সাজানো, পুরস্কারের হাতছানি
কত বক্তৃতা — 'আজ তো তোমাদের দিন'
না —
পেটের আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ ওরা
ওদের কাছে অন্য দিনের মতো
এদিনও বাঁচার লড়াইয়ের দিন।।

চরৈবেতি

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক)

বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই
তোমায় বড় করবে আরও,
চেষ্টা দিয়ে নিষ্ঠা দিয়ে
তুমিই তোমায় গড়তে পারো।
মনের কাচে ধুলো তুমি
পড়তে কভু দিও নাকো,
ভুলের ফাঁদে ভুলেও যেন
তোমার দুটি পা না রাখো।

ঈর্ষা দিয়ে অক্ষমতা
যায় না ঢাকা কোনোমতে,
বলবে তুমি সত্যকথা
চলবে তুমি সত্যপথে।
গুরুজনে লঘু করে
দেখার ভাবটা ছাড়তে হবে,
নিষ্ঠা ও শ্রম মিললে পরে
আশা তোমার পূরবে তবে।

শক্তি তোমার অসীম জেনো
ভয় কারে কয় জানবে নাকো,
সোজা পথে চললে তবেই
গড়বে তোমার জীবন সাঁকো।
তোমার কথায় কেউ কখনো
আঘাত যেন পায় না দেখো,
ভালবাসায় জীবন গড়ার
শপথটাকে সামনে রেখো।

নতুন কিছু করার স্বপ্নে
জীবনটাকে সাজিয়ে নিও,
গড্ডালিকায় না ভেসে তাই
স্বাতন্ত্র্যে সুর বাজিয়ে দিও।
জয়ের লক্ষ্যে অচল থেকে
আনবে তুমি নতুন আলো
তোমার সুরে সর মিলিয়ে
নতুন আলোয় ঘুচবে কালো।

ঝোড়ো হাওয়া বন্ধু তোমার
উদার আকাশ তোমার সাথী,
কাশের বনে ঢেউ তুলেছে
বাউল বাতাস, কাটছে রাতি।
নতুন দিনের নতুন সকাল
তোমায় দেবে নতুন চিঠি,
এগিয়ে চলার মন্ত্র নিয়ে
সামনে রাখো তোমার দিঠি।।

বাঁচতে দাও

নব্যেন্দু সাহা

শ্রেণী দশম

সবুজ ঘাস বলছে আমি বাঁচতে চাই
আমি তোমার ক্ষতি করিনি কোনো,
অনেক দিন চুপ করেছি
সকলে আজ আমার কথা শোনো।

মেঘের চিল বলছে, আমি উড়তে চাই
ফিরিয়ে দাও আকাশ ছোঁয়া ডানা,
অনেক গাছ সঙ্গে চাই
পরিস্কার গোটা আকাশখানা।

বৃষ্টি বলছে, আমি ঝরতে চাই -
সঙ্গে চাই দাপট মেশা হাওয়া,
উল্টে গিয়ে সেটাই হবে
তোমার কাছে জীবন ফিরে পাওয়া।

''আংশিক স্বাধীনতা জঘন্যতম দাসত্বের নামান্তর'
—এডমণ্ড বার্ক

ভাবনা

অভিজিৎ বসু (শিক্ষক)

রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার পথে
শহরে বন্দরে গ্রামে চোখ টানে কত স্ট্যাচু।
মহামানবেরা স্থায়ী হয়ে আছেন
মার্বেল, ব্রোঞ্জ, সিমেন্ট বা ফাইবারে।
অমর হয়ে আছেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী
লেখক কবি বা খেলোয়াড় তাঁদের কীর্তি নিয়ে।
ইতিহাসের অধ্যায়গুলিও তো আসলে সেই
অতিমানবদের মিছিল। পাতায় পাতায় ভিড় করে আসেন
রাজা সম্রাট বাদশা ওমরাহ লর্ড বিপ্লবী বিদ্রোহী
কবি শিল্পী সাহিত্যিকের দল।
কিন্তু, কই, অনেক খুঁজেও কেন
একজন সমালোচকের স্ট্যাচু পাই না? পাই না ছবি,
না রাস্তার ধারে, পার্কে বন্দরে, কিংবা
ইতিহাসের পাতায়।
এই প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসে, বারে বারে,
উত্তরও হয়তো অতি সহজ এবং জানা।
একজন সমালোচককে সহজেই উপেক্ষা করা যায়
কারণ তিনি কারোর সম্মানের প্রত্যাশা করেন না।
ইতিহাসও তাঁকে সম্মান জানাতে ব্যস্ত হয় না।
কারণ সমালোচনা করে কেউ বড় হয় না।
হয়তো ....।

শিল্পী ঃ রাফায়েল

শিক্ষক দিবসে (সনেট)

শৌর্য্য মিত্র
শ্রেণী একাদশ

অজানার আবরণ করি উন্মোচন,
অসত্যের বন্ধনেরে খুলি দিবা নিশা,
তুমিই দেখিয়েছিলে সে আলোর দিশা
যে আলোয় নিত্য করি জ্ঞান আহরণ।

তুমিই শিখিয়েছিলে হাঁটতে সে পথে -
যে পথে রয়েছে বাধা, কাঁটা শত শত
যে পথ চেনে না কোনো শিশু সদ্যোজাত,
তুমিই শিখালে তা প্রফুল্ল মনোরথে।

মোর শিরে সর্বদা ছিল তোমার পাণি।
ত্রুটিতে তুমি কভু করোনি তিরস্কার,
নিয়েছো স্বহস্তে মানুষ গড়ার ভার
তুমি দেবতুল্য - মোরা সকলে তা মানি

শিক্ষক দিবসে আজি দিনু উপহার
শিক্ষকের চরণে মোর সনেট খানি।

শিল্পী ঃ পাবলো পিকাসো

''আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।''
— কামিনী রায়

ODE TO SPRING

Dipak Kumar Sikdar (Retired Teacher)

O sweet Pretty Prince of glorious clime
Comest thou to the ailing bosom of winter,
The floral chaplet on the forehead
Relieves the wisened snow-white blur

The wavy wind maddened in the perfume
Radiates the cheerful message to the brow,
The angels call upon the white pearls
To attend thy rich banquet now.

The enticing zeal breeds a new hope,
Life revives ever in every turn.
A look at thy visage brings an opulent paragon
And glory ouerflows in the smiling sum.

The silver gems in dark night
Dazzle smartly in thy glistening Crown, O spring,
Under the blue canopy over thy head
Blows the fife of hymeneal tune to sing.

A pleasure thrills from thy coloured raiment
And the cramped mind becomes a vibrant boy
O holy trail pervade a gentle touch
O the mighty view resume the lost joy.

PARADISE LOST

Soumen Ganguly (Assistant Teacher)

Lance! Are your arms so strong!
Did you think before your leap?
The tragic fall of tarnished hero!
How can we accept it with easy heart?

The comeback hero with invincibility!
Were you not the inspiration for all?
Ailing people found solace in your feat,
Was it not possible without forgery?

It was too severe to be swallowed,
Who dragged you into the cesspool?
No need to retain your crown,
Will it not take you into the oblivion?

Perched into the Paradise of glory!
Are you ready for your nemesis?
Thy gems will be dispossessed!
Is there any scope for redemption?

ছবি ঃ ক্রিসেনথিমাম
শিল্পী ঃ পিয়েত মন্দ্রিয়ান

জানার কথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্ট্যাচু অব লিবার্টি (উচ্চতা ৩০০ ফুট), ওজন ২২৫ টন, ইস্পাতের কাঠামোর উপর তামার পাত) স্থাপিত হয় ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের প্রতীক রূপে। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ড।

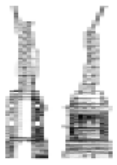

বিশ্বখ্যাত আইফেল টাওয়ার (উচ্চতা ৯৮৪ ফুট, ২৮৯ মিটার) স্থাপিত হয় ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে।

এই দুই আশ্চর্য নির্মাণের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে - দুইটিরই নকশা করেছিলেন প্রতিভাবান স্থপতি গুস্তাভ আইফেল। (Millennium year by year, DK, 1998)

ছোটগল্প

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না

অভিষেক সরকার
শ্রেণী চতুর্থ

একটি গ্রামে রাম বলে একটি ছেলে ছিল। তার বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। সেই গ্রামে একটি স্কুল ছিল। স্কুলটির নাম শিশু কল্লোল পাঠশালা। রাম ঐ স্কুলে সব পরীক্ষায় প্রথম হত। ঐ স্কুলেই বিষ্ণু বলে আর একটি ছেলে ছিল। সে পরীক্ষায় মোটেই ভালো ফল করত না। সেই জন্য কেউ তাকে ভালোবাসত না। পরীক্ষায় সবার শেষে নাম উঠত তার। কিন্তু সে ছিল খুব সৎ। সে কখনও কোনো পরীক্ষায় টুকলি করত না। রাম কিন্তু টুকলি করত। এইভাবে বেশি নম্বর পেতে পেতে রামের মনে খুব অহংকার হল। সে সবাইকে বলত, তোরা পরের পরীক্ষায় কেন, কোন পরীক্ষাতেই আমার সঙ্গে পারবি না। এই আস্ফালন শুনে বিষ্ণুর মনে খুব রাগ হত। এখন, বিষ্ণুরা ছিল খুব গরিব। রামের দেখাদেখি ক্লাসের অনেকেই টুকলি করতে লাগল। বিষ্ণু কিন্তু আগের মতোই খুব কষ্ট করে পড়ে যেতে লাগল এবং শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করল। তার স্বপ্ন ছিল যে, সে একদিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হবে। তার এই আত্মবিশ্বাস ফল দিল। শেষ পর্যন্ত রামের হার হল, বিষ্ণুর হল জিত। এর জন্যই বলে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

ঘুম

গৌরব দাস
শ্রেণী চতুর্থ

জানি না ওর সঙ্গে কেন আমার এত মধুর সম্পর্ক। যখন আমি খুব ছোট ছিলাম তখন বেশিরভাগ সময়টাই ওর সঙ্গে কাটাতাম। যখন শৈশবে পা রাখি তখন ওকে একটু এড়িয়ে চলতাম কারণ পড়াশোনা করে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই পড়াশোনায় মন দিলাম। ও কিন্তু আমায় ছাড়া একটা দিনও থাকত না। ও আমায় সকালে করে ইশারা, দুপুরে দিকহারা ও রাতে দিশাহারা। রাত ৮ টা নাগাদ দেয় ডাক, আমি বলি থাক, থাক। চোখে তেল ঘষে আবার পড়তে বসে যাই, পড়াটা অবশ্যই করা চাই। সকাল ১০ টায় স্নান করে ভাত খেয়ে বসি বাসের সিটে, ও আমায় করে ডিসটার্ব দু-চোখ সেঁটে। যখন আমি ভোরের আকাশকে দেখতে চাই, ও আমায় ডাক দিয়ে বলে বিছানায় থাকোনা ভাই। আমি বলি, না না সুন্দর প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় চাই। জানো তোমরা সকলেই এই 'ওটি' হল আমাদের সকলের প্রিয় নিদ্রাদেবী যার দয়ায় সকলে বেঁচে থাকি, সে আমাদের সুখের রাত্রির ও দুপুরের 'ঘুম'।

''মনের খেয়ালে দেয়ালে দেয়ালে লিখে যায় কত কবিতা
আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।''
—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

ধৈর্য

দীপেশ দাস
শ্রেণী সপ্তম

অধিকাংশ মানুষের জীবনেই যে কোন কাজে বা উন্নতির পথে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি আসে। কেউ কেউ সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, আবার কেউ কেউ বাধা - বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে ভেঙে পড়ে অথবা থেমে যায়। বিচলিত হওয়ার কারণ সত্ত্বেও মনকে শান্ত রাখাই হল ধৈর্য। একাগ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধৈর্যও বৃদ্ধি পায়। জীবনের কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে ধৈর্যের অত্যন্ত প্রয়োজন।

ডেমোস্থিনিস অত্যন্ত তোতলা ছিলেন। যখনই তিনি কথা বলতে শুরু করতেন তখন তোতলামির জন্য কথা বলতে কষ্ট হত এবং তাঁর কথা ভালো বোঝা যেত না। কিন্তু তাঁর বাগ্মী হওয়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল। তিনি বাগ্মী হওয়ার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মতো এক টুকরো নুড়ি জিভের তলায় রাখতে লাগলেন। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা অভ্যাস করতেন। দিনে প্রায় ষোলো ঘন্টা করে পড়াশুনো করতেন। প্রায় তিন বছর এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি একজন বাগ্মী হয়েছিলেন।

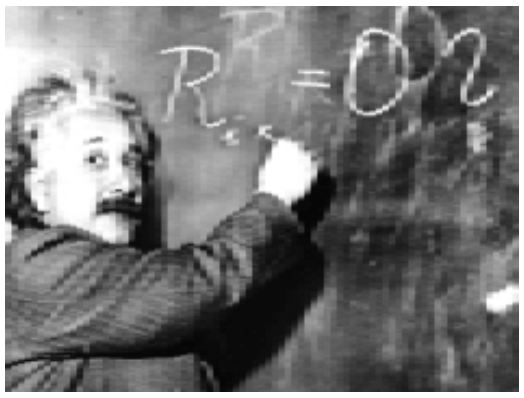

চিত্র ঃ ইন্টারনেট

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে কোনো এক স্কুলের এক ছাত্রী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘স্যার, আমি অঙ্কেতে অত্যন্ত দুর্বল, ক্লাসে সবসময় পিছিয়ে পড়ি, আর আমার সহপাঠিনীরা আমাকে নিয়ে হাসি - ঠাট্টা করে। আমি কী করি বলুন তো?’’ আইনস্টাইন উত্তর দিয়েছিলেন, ‘‘বাছা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করে যাও, কখনো হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে লেগে থাকো, দেখবে তুমি খুব শীঘ্রই অঙ্কে উন্নতি করবে। আর আমার কথা বিশ্বাস করো, আমিও আমার অঙ্ক নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি।’’ আইনস্টাইন তখন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সমাধান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

আর একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটন তাঁর পঁচিশ বছরের গবেষণার ফলাফল সমন্বিত কাগজপত্র পড়ার টেবিলে রেখেছিলেন। তাঁর একটি পোষা কুকুর টেবিলের উপর রাখা একটি জ্বলন্ত মোমবাতি উল্টে দেওয়াতে তাঁর পঁচিশ বছরের গবেষণার সমস্ত কাগজ পত্র পুড়ে যায়। এতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। পুনরায় উৎসাহের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে গবেষণার কাজ করে সাফল্য লাভ করেছিলেন।

‘‘ভাঙতে সবাই পারে গড়তে পারে কজন?
নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সবাই; কিন্তু কি করে
যে তাকে ভালো করতে হবে তা বলতে পারে ক’জন?’’

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আমার লাট্টু ঘুড়ি

সাওন মুখার্জী
শ্রেণী পঞ্চম

গতবছর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বাবাকে বলেই ফেললাম, 'বাবা আজ কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। আজ বিকালে আমরা মাঠে ঘুড়ি ওড়াবো। সকালে বাবা আর আমি বাজারে গিয়ে লাটাই, মাঞ্জা দেওয়া সুতো আর কয়েকটা ঘুড়ি কিনে আনলাম। সারা দুপুর মনটা ছট ফট করতে লাগল। কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকাল হতেই বাবা আমার পিঠ চাপড়ে বলতে লাগল,

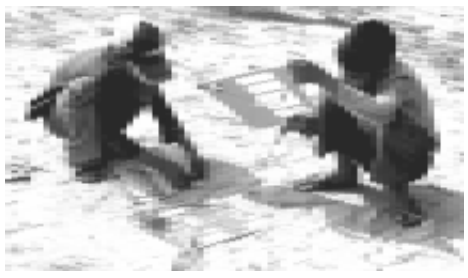

- কিরে সাওন? ঘুমিয়ে আছিস যে, ঘুড়ি ওড়াতে যাবি না? আমি একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে, চোখ -মুখ ধুয়ে দুজনে ঘুড়ি ও লাটাই নিয়ে মাঠে গেলাম। তখন মাঠের চারদিকে যেন ঘুড়ির মেলা বসে গেছে। আকাশে নানা নামের ও নানা রঙের ঘুড়ি উড়ছে। শন্ - শন্ বাতাসে আমার প্রথম ঘুড়ি লাট্টু উড়ে গেল। হঠাৎ একটা পেট কাটা ঘুড়ি এসে আমার লাট্টু ঘুড়ির সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিল। আমিও ঐ ঘুড়িটিকে কাটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নানা লোক নানা ধরনের কথা বলছে। কেউ বলছে টেনে দিতে, কেউ বলছে ঢিল ছাড়তে। আমি আমার ঘুড়ির মাঞ্জা ধরে জোরে টান দিতেই পেটকাটা ঘুড়িটা কেটে গেল। আমার বাবা বলল - দারুন লড়েছিস, একটা রসগোল্লা পাওনা রইল। আমার বন্ধুরাও খুব আনন্দ পেল। এবার আমি বাবার কাছ থেকে আর একটা রসগোল্লা আদায় করার জন্য সিঁদুরমুখী ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ লাগিয়ে দিলাম। এইবারও আগেকার মতো নানা লোক নানা কথা বলল। কিন্তু আমি তাদের কথা না শুনে আমার প্রিয় বন্ধু রোহিতের কথা শুনে ঢিল ছাড়লাম এবং সিঁদুরমুখী ঘুড়িটিকেও কেটে দিলাম। বাবা খুব খুশী। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলো। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। আমাদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। আমি ঘুড়িটিকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। এমন সময় একটা দমকা হাওয়া এসে ঘুড়িটিকে উপড়ে নিয়ে গেল। আমার খুব দুঃখ হল। আমার খুব ইচ্ছা ছিল ঘুড়িটিকে নীচে নামিয়ে বলব,- "Thank you, my dear and sweet kite"। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূরণ হল না।

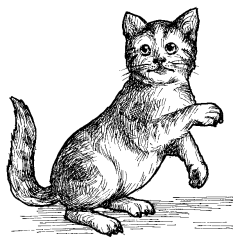

আমার দেখা একটি করুণ ঘটনা

দেবজ্যোতি মিত্র
শ্রেণী চতুর্থ

আমি একটি ঘটনা দেখেছিলাম। তার স্মৃতি এখনো আমার মনে ফিরে ফিরে আসে। আমার বাড়ির পাশের একজন কাকিমা থাকেন। একবার তাঁদের বাড়ির ছাদের এক কোণে একটা পিচবোর্ডের বাক্সে একটি বিড়াল তিনটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল। বিড়াল ছানাগুলি যেন এক-একটা সাদা তুলোর বলের মতো তুলতুলে ছিল। নাকগুলি ছিল লাল রঙের। আমি প্রতিদিন বিকেলবেলায় তাদের দুধ ও বিস্কুট খাওয়াতে এবং তাদের সঙ্গে খেলা করতে কাকিমাদের ছাদে যেতাম।

কিন্তু একদিন দেখলাম যে কাকিমা ছাদ থেকে সেই ছোটো ছোটো বিড়ালছানাগুলিকে আমাদের বাড়ির পাশের ফাঁকা জমিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। পরের দিন আমাদের বারান্দায় গিয়ে দেখলাম যে মা বিড়ালটি তার বাচ্চাদের নিথর দেহগুলির পাশে বসে সমানে কেঁদে চলেছে। এভাবে তিন-চারদিন মা বিড়ালটির কান্না শুনতে পেয়েছিলাম।

তাই এখন ভাবি মানুষ কেন এত নির্দয় হয়। শুধু প্রাণীদের সাথেই কেন, আর কারও সাথেও যেন মানুষ আর এরকম দুর্ব্যবহার না করে — ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। আমার আজও মনে পড়ে সেই ছোট্ট বিড়ালগুলির কথা।

"বইয়ের স্বাদ একবার পেলে খিদে বাড়তেই থাকে"
— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ফল চোর

সুমন্ত মন্ডল

শ্রেণী চতুর্থ

এক গ্রামে সাত বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে তিনজন ছিল সর্দারগোছের। তাদের নাম হল অর্ক, সানু আর শুভ্রজ্যোতি। ওই গ্রামে এক বাড়িতে বড় একটি বাগান ছিল। ওই বাগানে কাজ করতো এক মালী। সে ছিল খুব কড়া। কাউকে গাছের ফল তো দূরের কথা ঝড়ে পড়া ফল ও কুড়োতে দিত না। অর্ক, সানু আর শুভ্রজ্যোতি ঠিক করল তারা সেই বাগান থেকে ফল চুরি করবে। তারা একদিন আলোচনা করে একটা মতলব আঁটলো। পরের দিন সকাল ১০ টার সময় সেই বাগানের সামনে হাজির হল। তারপর দুজন সানুকে বলল, শুরু কর। সানু মতলব মত কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাতে লাগল, ''আঃ কী পেটে ব্যথা করছে। আর বাঁচবো না।'' সেই আর্তনাদ শুনে মালী ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ''কী হয়েছে?'' অর্ক বলল ''আমরা তিন বন্ধু দূরের গ্রাম থেকে বেড়াতে এসেছি। আর এই দেখুন আমাদের বন্ধু সানুর হঠাৎ খুবই পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। কোথায় ঔষধ পত্র পাই, কী যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না।'' মালী বলল ''ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলো।'' অর্ক এবং শুভ্রজ্যোতি সানুকে ধরাধরি করে মালীর ঘরে নিয়ে গেল। সানুকে ধরে ঘরে শোয়ানো হল। মালী তাকে বাতাস করছিল হাতপাখা দিয়ে। অর্ক তখন বলল, ''শুভ্রজ্যোতি তুই এখানে বস। আমি বাইরে গিয়ে বাড়িতে একটা ফোন করে আসি। সানু চুপচাপ পেটে ব্যথার ভান করে শুয়ে রইল। কিন্তু মালী তা বুঝতে পারে নি। অর্ক বাইরে গিয়ে একটা ব্যাগ বের করল তার পকেট থেকে। সে গাছে উঠে টপাটপ অনেক ফল পেড়ে ব্যাগে ভরল। তারপর ফলভর্তি ব্যাগটা বাগানের বাইরে একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখল। অর্ক যখন ফিরে এল তখন সানু চোখ পিটপিট করে তাকে দেখতে লাগল। তখন সানু উঠে বসে বলল, ''এবার আমার পেটে ব্যথা কমে গেছে।'' এবার তারা বাড়ি ফিরে যাবে। এরপর তারা বাগানের বাইরে এসে ফলের ব্যাগটি নিল এবং দূরে মাঠে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ফলগুলি ভাগ করে মনের আনন্দে খেল। তবে মালীকে ফাঁকি দিয়ে ফল খাওয়ার আনন্দ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। মনটা তাদের খচখচ করতে লাগল। মালীর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো হল নাতো? পরে তারা মালীর সঙ্গে দেখা করে তার কাছে মাপ চেয়ে কিছু টাকা দিতে গিয়েছিল। মালী কিন্তু সেদিন ওদের পেট ভরে ফল খাইয়ে দিল। ওর চোখের কোণে ছিল হাসি, হয়তো নিজের ছোটবেলার দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

গ্রামের অস্ফুট কান্না

সেখ মইনুল

শ্রেণী তৃতীয়

গ্রামের নাম বেহুলা। বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় এই গ্রামে। এই গ্রামের মানুষরা একসাথে মিলেমিশে থাকে। আমার মামার বাড়ি এই গ্রামে। যখন ছোট ছিলাম, স্কুলের ছুটি পড়লেই মামার বাড়ি চলে আসতাম। এই গ্রামের মাঝখানে একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরের জল ছিল কত পরিস্কার। পুকুরের চারিদিকে কত গাছগাছালি। গাছে বিভিন্ন রকমের কত পাখ-পাখালি মনের আনন্দে খেলা করত। আমরা সবসময় সেখানেই থাকতাম, আর দেখতাম পুকুরে ব্যাং, মাছ সবাই কত আনন্দে খেলা করছে। সেখানে আমাদের সাথে খেলত সহীদ, রাজা, সুমি, মিমি আরও কতজন! গাছের পাখিরা আমাদের পেয়ে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। আমরা চলে এলে বোধহয়, ওদেরও মন খারাপ হয়ে যেত। এখন আমরা বড় হয়ে গেছি। এখন আর ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়া হয় না।

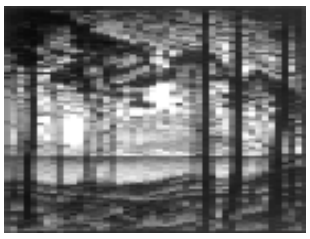

কিন্তু হায়! এবার গিয়ে দেখলাম, সেই পুকুর বুজিয়ে বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এখন আর সেই পুকুর নেই, সেই গাছগুলোও নেই, পাখিরাও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। জানি না, মানুষের পরিবেশ বিনাশের এই নেশা কবে শেষ হবে। আমি যেন এখনও গাছগুলোর কান্না শুনতে পাই। তারা যেন বলছে, ''আমাদের এইভাবে শেষ করে দিও না। আমাদেরকেও বাঁচতে দাও''। জানিনা মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় কবে হবে! কবে তারা গ্রামকে বাঁচার সুযোগ দেবে।

পথের দিশা

সুরজ মিত্র
শ্রেণী অষ্টম

সোনারপুর একটি ছোট্ট গ্রাম। তারই কোলে বিরাজমান 'সোনারপুর বিদ্যায়তন'। সেখানে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে নবীন। পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল তার। সে পড়তে ভালোবাসত। কিন্তু বাবার জমি, জমিদার বাজেয়াপ্ত করার পর নবীনের সংসারে অর্থসঙ্কট নেমে এল। পড়ায় পড়ল ছেদ। ক্রমে সে বিপথগামী হতে লাগল। মেলামেশা বাড়ল বাজে ছেলেদের সাথে। বিড়ি - সিগারেট খেতে আরম্ভ করল আর বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত সারাদিন।

সেই গ্রামেই অলোক বলে আর একটি ছেলে ছিল। মোটামুটি অবস্থা তাদের। একসময়ে নবীনের সহপাঠী ছিল সে। নবীনের পড়ার প্রতি ভালোবাসার কথা সে জানত। এমন একটি ছেলেকে খারাপ পথে চালিত হতে দেখে সে ব্যথা পেল। শপথ নিল যে নবীনকে সঠিক পথে ফেরাবেই। সে বুঝল, পড়াশোনার প্রতি নবীনের আগ্রহটা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সেই মত সে একদিন নবীনের কাছে গেল। তাকে পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝাতে চাইল বারবার। কিন্তু নবীন কোন কথায় কান দিল না। অলোক তখন একটা বুদ্ধি বার করল। একসময় নবীনের ঘরে গোপনে দুটো বই ও তার লেখা চিঠি দিয়ে এল। সে জানলা দিয়ে নজর রাখল। দেখল, বই হাতে পেয়ে নবীনের চোখগুলো চিক্ মিক্ করছে। এরপর থেকে অলোক নবীনকে নিয়মিত বইপত্র দিত। তার যদি সমস্যা থাকত সে সাবধান করে দিত। বোঝাত, পড়াশোনাটা মন দিয়ে করলে আর অর্থসমস্যা থাকবে না। জীবনে অনেক বড়ো হওয়া যাবে, মানুষ হওয়া যাবে। নবীনও বুঝতে শিখল, কেবল টাকার অভাবের জন্য পড়াশোনা বন্ধ করা ঠিক নয়। এখন সে হয়তো নিয়মিত স্কুল যেতে পারবে না। তবে পরীক্ষা তো দিতে পারবে। এভাবে সে ধীরে ধীরে নিজের পথে ফিরে এল। পড়াশোনাটা নতুন করে ভালো লাগতে লাগল। রাত কেটে আবার যেন ভোর হল। নবদিগন্ত খুলে গেল নবীনের চোখের সামনে। সে তার বন্ধু অলোকের অবদানকে সম্মান জানাল।

পাশটাশ করে নবীন ও অলোক দুজনেই 'সোনারপুর বিদ্যায়তন' - এর শিক্ষক হল। পড়াশোনার গুরুত্ব যাতে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারে, সকলকে যাতে জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত করতে পারে, সেই সাধনায় ব্রতী হল। তারা জানত, তারা একদিন সফল হবেই। কারণ, তাদের মনে আছে জোর, বুকে রয়েছে বল, ভরপুর আত্মবিশ্বাস।

জানার কথা

ভারতমাতা ঃ ১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার আসে তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্র অঙ্কন করেন ১৯০৪ সালে।

(ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র)

উদ্ভাবন

সঞ্জীবন হাটী

শ্রেণী নবম

যার স্থান, কাল, পাত্র, নেই, নেই গ্রহণের ভিন্নতা, তার মূলেই উদ্ভাবন। উদ্ভাবিত- বয়স আছে, স্থান, পাত্রও আছে তবে গ্রহণের ব্যাকুলতা অর্থহীন। কারণ উদ্ভাবন বা সৃষ্টিই যদি না হয়, তবে স্রষ্টা বা সৃষ্টি কোনটারই মূল্য থাকা সম্ভব নয়। সৃষ্টির রূপান্তরে অমর হয় স্রষ্টা। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে তাঁর যাবে, শুধুমাত্র সৃষ্টিই থাকবে অমর হয়ে। সেই কারণেই 'রবীন্দ্রস্মরণ' বলতে তাঁর গান, কবিতা, নাটকই বুঝি, তাঁর বা অনুপস্থিতিকে নয়। এই খানেই সৃষ্টির অমরত্ব। 'প্র ছবি কে, কবে, কোথায় দেখেছে? তবু সেই প্রকৃতিই আমাদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করছে। কারণ অত্যাশ্চর্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর জ্যোৎস্নার মায়াজাল অথবা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর খুনসুটি তারই দান। যখন নিকষ কৃষ্ণ চাদরে আকাশ ঢেকে যায়, আর তার বুকে সাদা বকের সারি ওড়ে — সেই মায়াবী দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করে। আবার যখন নিঃসঙ্গতা দূরীকরণে চন্দ্রদেব আমাদের সহায় হন, তখনও সেই জ্যোৎস্না যেন মনের মেঘকে সরিয়ে দেয়। তাই তো সৃষ্টি অমর। 'পথের পাঁচালী'-র অপু-দুর্গা যখন কাশবন দিয়ে রেল দেখতে যায়, তখন সাদা কাশের মাথা দোলানোর সাথে যেন তাল মেলায় কুন্ডলীকৃত রেলের কালো ধোঁয়া। সেই মুহূর্তে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সত্যজিৎ রায় সত্যিই ঝাপসা হয়ে ওঠেন। সৃষ্টির কাছে স্রষ্টা অবলীলায় মাথা নত করেন।

শিল্পী মরিৎস কর্নেলিস এশার

একইভাবে '২৫ পীটর ব্রখেল' অঙ্কিত 'দ্য ম্যারেজ পার্টি' অথবা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত 'টেম্পারা' আমাদের মুগ্ধতা দান করে।

সেই কারণেই সৃষ্টি অমর - অক্ষয় - চিরন্তন। এভাবেই হয়তো 'চিরসত্য' রূপে সৃষ্টি বিরাজ করছে যার বাহ্যিক পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রূপান্তর হয়তো অসম্ভব! এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই 'উদ্ভাবন' শুধুমাত্র নিজের স্বতন্ত্রতার কথা প্রকাশ করে। স্রষ্টা সৃষ্টির মূলে অবস্থান করলেও হয়তো এই জন্যই সে সৃষ্টির মতো উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বল ধ্রুবতারার পাশে তার অস্তিত্বই শুধু সম্ভব। আর ধ্রুবতারারূপী 'উদ্ভাবন' চিরকাল নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আজও আছে, পরেও থাকবে সম্পূর্ণ চির স্মরণীয় হয়ে।

কীট পতঙ্গের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

দেবদীপ লাহা

শ্রেণী সপ্তম

তখন ছিল শীতকাল। আমি আমাদের বাড়ির ছাদে পড়তে বসেছি। পড়তে পড়তে আমার হঠাৎ নজর পড়ল একটি বাচ্চা মাকড়সা ও একটি মাছির উপর। মাকড়সাটি বারবার মাছিটিকে ধরতে যাচ্ছে কিন্তু মাছিটি উড়ে গিয়ে আবার ঐ জায়গাতেই ফিরে আসছে। তখন মাকড়সাটি কৌশল পাল্টে একবার মাছিটির ডান পাশ থেকে এবং তার পরবর্তীকালে বাঁ-পাশ থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কৌশল কাজে লাগল না। এবং মাছিটি উড়ে গেল। তার পরমুহূর্তেই দেখি যে মাকড়সাটি উধাও। ভালো করে চেয়ে দেখি মাকড়সাটি তখন আসলে উধাও হয়নি, সে তার গায়ের রং মিলিয়ে দেওয়ালে লুকিয়ে ছিল। এরপর নিশ্চিন্ত মাছিটি যখন আবার ফিরে এল তখন মাকড়সাটি চুপিচুপি দেওয়াল থেকে নামল এবং মাছিটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে তার শিকারকে নিয়ে আবার দেওয়ালের ফুটোর মধ্যে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল যে একটি বড় জাতের মাকড়সা ঐ ছোট মাকড়সাটির উপর নজর রেখেছে। খাবার খেয়ে ওই ছোট মাকড়সাটি যখন ঐ দেওয়ালের ফুটো থেকে বাইরে বেরোলো তখন সেই বড় মাকড়সাটি ঐ ছোট মাকড়সাটিকে ধরে খেয়ে ফেলল। আমরা ভাবতে পারি কেন এ নিষ্ঠুরতা! কিন্তু আমাদের এই কথাটা ভুললে চলবে না যে এই রকমের খাদ্য - খাদকের সম্পর্ক আছে বলেই জীবজগৎ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

ভুতুড়ে বাড়ি

ঋষভদেব গায়েন
শ্রেণী - অষ্টম

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রামটি ছোট। চারপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়ে ভর্তি। কিন্তু গ্রামের দক্ষিণ দিকে কেউই যেতে চায় না। এমনকী গ্রামের গোরু, ছাগল, পাখি - পক্ষী পর্যন্ত যেতে চায় না। একবার একদল ছাত্র এসেছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে। ছাত্ররা পথে এক বৃদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘দক্ষিণদিকে ঐ বাড়িটায় যাওয়া যাবে?’’ বৃদ্ধ বললেন, ‘‘না ও দিকে যেও না।’’ ‘‘কেন?’’ ছেলেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

‘‘শোনা যায়, আজ থেকে প্রায় ১৫৫ বছর আগে ওটা ছিল একটা নীলকুঠি ঘর। নীলকরদের অত্যাচারে অনেক সময় মানুষ মারা যায়। তার পর ঐ বাড়িতে কেউ যেতে চায় না। রাত্রিতে যেই ওখানে যায় তার লাশ পড়ে থাকে নিচের এক গর্ততে। এই পর্যন্ত এভাবে তিন জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তাই বলছি, ওদিকে কেউ যাবে না।’’ ছেলেরা বলল, ‘‘এতক্ষণ যখন শুনলাম তখন তো দেখতেই হয় রহস্যটা। আমরা যাব ঐ বাড়িটাতে’’। তাই ছেলেরা রাতের খাবার দাবার নিয়ে চলে গেল ঐ বাড়িটাতে। সন্ধ্যা নামল। ছেলেরা বলল, ‘‘কিছুই তো হল না। যত সব আজগুবি ঘটনা। চল, সব খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।’’

রাত ১১ টা বাজল। সবাই দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেছে। হঠাৎ, ধুম করে একটা বিকট আওয়াজ। দরজাটা ঠক ঠক করছে কে? একটা ছেলে বলল, ‘‘হয়ত ইদুঁরে দরজাটা কাটছে।’’ হঠাৎ আবার আওয়াজ - খক, খক, খক .....। ‘কে?’, কোন আওয়াজ নেই। আবার একই শব্দ। রবীন নামে একটা ছেলে বলল, ‘‘বাইরে গিয়ে না দেখলেই নয়।’’ রমেশ বলল, ‘‘এই ভুতুড়ে বাড়িতে বাইরে যাবে! ইডিয়েট একটা।’’ হঠাৎ, ‘‘বাঁচাও, বাঁচাও’’ করে ভয়ানক আর্তনাদ শোনা গেল। ছেলেরা বলল, ‘‘এবার বাইরে গিয়ে দেখতেই হয়।’’ সবাই বাইরে গিয়ে দেখল একজন টলতে টলতে হাঁটছে। বলল, ‘‘কে ওখানে? যা বাবা গেল কোথায়?’’ ছেলেরা তখন ভয় পেয়ে বলল, ‘‘না! ওখানে আর থাকা যাবে না।’’ ভয়ে সবাই ঘর থেকে বেরোতে যাবে হঠাৎ প্রধান ফটক দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেরা যা হোক করে পাঁচিল টপকে পালাল। কিন্তু সবার পিছনে যে ছিল কে যেন তার মাথায় আঘাত করল। যন্ত্রনায় সে ছটফট করতে করতে মারা গেল। ছেলেরা কাঁদতে লাগল। ‘‘হায়! কেন আমরা বৃদ্ধ মানুষটার কথা শুনলাম না? আমাদের একজন বন্ধুকে এভাবে বেঘোরে হারাতে হল!’’

প্রবন্ধ

প্রয়াত শিক্ষক অনিলবাবু ও শিক্ষাকর্মী শিবুদা স্মরণে

স্বপন বিশ্বাস
(শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র)

একশ ত্রিশ বছরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়কে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন অসংখ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। সম্প্রতি তাদের মধ্যে দুজনকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হারালাম। প্রয়াত হলেন বিদ্যালয় অন্তপ্রাণ প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী শিবনাথ ঝা ও শিক্ষক অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। 'মিউনিসিপ্যাল স্কুল' গড়ে তোলার বা তাকে সযত্নে লালন করার পিছনে অনেকের মত এই দুজন মানুষের অবদান স্মরণীয়। সত্তরের দশকের শেষভাগ তখন আমরা দশম শ্রেণীতে পড়ি। কতদিন দেখেছি ক্লাসে অনিলবাবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় অঙ্ক করছেন। শিবুদা হেলেদুলে NOTICE এর খাতা হাতে প্রবেশ করলেন; শ্রেণীকক্ষে পকেট থেকে বের করলেন পান 'দাও শিবজী' বলে হাত বাড়িয়ে শিবুদার হাত থেকে পান নিলেন। শিবুদার মুখে অমলিন হাসি স্যারকে পান খাইয়ে। বর্তমান মানদণ্ডে তা অন্যরকম মনে হলেও প্রতিদিনের ঘটনায় আমরা, ছাত্ররা ভারী মজা পেতাম। আর যখন প্রাথমিক বিভাগে পড়ি শিবুদা টিফিন বিলি করতেন। (তখন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের টিফিন দেওয়া হত)। শিবুদার সতর্ক দৃষ্টি ছিল উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা যাতে ছোটোদের টিফিন কেড়ে না নেয়।

বিদ্যালয় অন্ত প্রাণ ছিলেন শিবুদা। এই বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। অসম্ভব স্নেহ করতেন ছাত্রদের আর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সহকর্মীদের প্রতি। শিবু দা সুদূর বিহারের কোনো এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কিভাবে এই বিদ্যালয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে আপন করে নিয়েছিলেন বর্ধমান আর বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলকে।

নব্বই এর দশকের শুরুতে আমরা কয়েকজন যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যোগদান করলাম শিবুদাকে আরও কাছ থেকে আমাদের দেখার সুযোগ হল। শুরুতে শিবুদা 'আপনি আজ্ঞে' করতে শুরু করায় কুণ্ঠিত হয়ে সকলেই বারণ করেছি শিবুদাকে। 'তোমরা কত পড়ালিখা করে মাস্টার হয়েছ, ছাত্র পড়াচ্ছ' তাই আপনি বলি। আমাদের তুমি বললে কোন রকম সম্মান হানি হবে না বলে কোন রকমে শিবুদাকে নিবৃত্ত করা গিয়েছিল। যতদূর জানি পন্ডিত পরিবারের ছেলে ছিলেন শিবুদা। বাড়িতে সংস্কৃতের টোল ছিল। কোন কারণে হয়ত পড়াশুনা বেশীদূর হয় নি। কিন্তু আচার ব্যবহারে শিবুদা সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিলেন। অজাতশত্রু এই মানুষটিকে প্রণাম জানাই। জীবিত অবস্থায় যা কখনও গ্রহণ করেন নি।

বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর প্রণাম করতে গিয়েছি অনিলবাবু স্যারকে। ভীষণ খুশী হয়েছিলেন আমার গণিত পড়ার ইচ্ছে শুনে। স্যার নিজে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আর গণিতের শিক্ষক ছিলেন। বহু বছর শিক্ষকতা করেছেন। ছোটবেলায় স্যার এর মুখে বিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক গল্প শুনতাম। বিদ্যালয়ে সবার সঙ্গেই ছিল স্যার এর প্রাণখোলা সম্পর্ক। কখনও দরাজ হাসি, কখনও কঠিন কঠোর মুখমন্ডল আবার পর মুহূর্তেই স্নেহশীল। প্রায়শই ছাত্রদের পিঠে চপেটাঘাত করতে দেখা যেত অথবা শব্দ শোনা যেত পাশের ক্লাস হতে। অনেক সময়েই রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে পড়েছে, ছাত্ররাও কিছু মনে রাখত না। অন্তিম যাত্রাতেও প্রাক্তনদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল স্যার এর শাসন, সে বিষয়ে সকলেই একমত। আসলে এ সবই ছিল স্যার এর আশীর্বাদ। নবম দশম শ্রেণীতে অঙ্কের প্রশ্ন ক রা খাতা দেখার বিষয়ে স্যার ভীষণ কড়া ছিলেন। বিদ্যালয়ের মান যেন নিম্নগামী না হয় সে বিষয়ে ভীষণ রকম সজাগ ছিলেন, সেখানে কোনোরকম আপোস করতেন না। গণিতে স্যার এর হাতে উত্তীর্ণ অপেক্ষা অনুত্তীর্ণের তালিকায় দীর্ঘ থাকত। অসম্ভব উৎসাহ ছিল নানা বিষয়ে। একসময় N.C.C করাতেন, বিদ্যালয়ের সকল অনুষ্ঠানে সক্রিয় থাকতেন। ফুটবল খেলা ভালবাসতেন। বিদ্যালয়ের খেলা থাকলেই দল বেঁধে হাজির হতেন, মাঠে উৎসাহ দিতেন। স্যার -এর শেষ যাত্রায় বিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্রদের উপস্থিতি আরও একবার ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কত গভীর হতে পারে তা প্রমাণ দেয়।

জানার কথা

মরিৎস কর্নেলিস এশার (Mauritz Cornelis Escher, 17 June 1898 - 27 March 1972) এই ডাচ শিল্পী বিশ্বখ্যাত তাঁর গণিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত চিত্রের জন্য। তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য হল অসম্ভব কাঠামো, অসীমের নানা সম্ভাবনা, স্থাপত্য ও পরস্পরছেদী ঘনকের ব্যবহার। তাঁর মাধ্যম ছিল উডকাট, লিথোগ্রাফ ও মেজোটিন্ট। (Wikipedia)

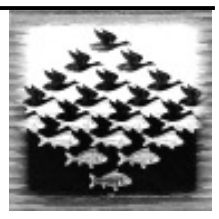

ফেলে আসা ছড়াগুলি

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
(শিক্ষক)

দিনকাল যে খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে তা চোখ কান খোলা রাখলে বেশ বুঝতে পারা যায়। আমি বেশ বুঝতে পারি আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গে আজকের ছোটদের 'ছেলেবেলা'র কী বিপুল ফারাক। আমাদের ছোটবেলায় বাড়িতে বাজত একটা ভাঙা রেডিও সম্ভবত 'বুশ' কোম্পানীর। মাঝে বন্ধ হলে তার মাথায় পড়ত চাঁটি, আবার সে শুরু করত চলতে । আর আজকের কচি কাঁচারা চোখ পেতে রাখে দূরদর্শনের পর্দায়। দেখে 'টিনটিন' পেঙ্গু, 'অসওয়াল্ড', 'স্কুবিডু', 'বব দ্য বিল্ডার্স', 'টম এণ্ড জেরী'। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি আজকের শিশুমনকে যেমন সীমাহীন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে, তেমনি কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু। আজকের ছোটরা ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে শুনতে পায় না রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, শুনতে পায়না ঠাকুমার ঝুলির গল্প, শুনতে পায় না মন মাতানো সব ছড়া, যা আমাদের শৈশবকে ভরিয়ে রাখতে নির্মল আনন্দে। শৈশবের স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে ছেলে ভুলানো সেই ছড়াগুলির কথা, যুগ যুগ ধরে যেগুলি বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে, স্থান করে নিয়েছে বাঙালী মনের মণিকোঠায়। কোন বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করে নয়, কখনো বাংলার নদনদী, কখনো ঘুমের দেশের ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, কখনো আকাশের চাঁদ-তারা, আবার কখনো আদরের খোকাখুকু হয়ে উঠেছে ছড়ায় সামগ্রী। কেবল কচিকাঁচাদের নয়, বড়দেরও মন কেড়ে নেবার ক্ষমতা রাখে চতুর্মাত্রিক এই ছন্দের দোলা। বাংলা ভাষার সঙ্গে এই বাংলা ছড়াগুলির নাড়ীর যোগ অনুভূতি। তাই বাংলা ভাষা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবির মনে পড়ে যায় কোন যে সুদূরে মা তাঁর দোলনা দুলিয়ে গাইছেন ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া -

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
ঘুম দিয়ে যা,
বাটাভরে পান দেব
গাল ভরে খা।।

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এস।
খাট নেই পালং নেই
চোখ বেতে বাস।।

আয় ঘুম যায় ঘুম
বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমায়
জাল মুড়ি দিয়ে।।

কেবল ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি নয়, খেলার রাজ্যেও এই ছড়াগুলির নিত্য আসা যাওয়া। এই ছড়ার ছন্দেই মেতে ওঠে আমাদের 'ইক্‌ড়ি মিকড়ি', 'জল ডিঙা ডিং', 'কানামাছি', 'আটুল-বাটুল', কিম্বা 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম', খেলা -

ইক্‌ড়ি মিকড়ি চামচিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার
দামোদরদের হাঁড়িকুড়ি,
গোয়ালে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে গেল বেলা
ভাত খাওসে দুপুর বেলা,
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা।।

আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল
শামলা গেছে হাটে।
শামলাদের মেয়ে গুলো পথে বসে কাঁদে
আর কেঁদো না ছোলা ভাজা দেব
আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব।।

খোকা কিংবা খুকুর মনভোলানোই ছড়াগুলির প্রধান কাজ। তাই সেখানে কখনো খুকুর দুধে চিনি মেশে, কখনো ভোঁদর দেখে খোকার নাচন, কখনো খুকু জল আনতে যায় পদ্মদীঘির ঘাটে, আবার কখনো খোকার সঙ্গে খেলার জন্য আহ্বান জানানো হয় বনের টিয়াকে।

আয়রে আয় টিয়ে নায় ভরা দিয়ে।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে তা দেখে দেখে ভোঁদর নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা খোকার নাচন দেখে যা।

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।

খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।

ছড়ার রাজ্যে চাঁদ অধিষ্ঠিত মামার আসনে
চাঁদের কপালে টিপ দিতে তার জুড়ি মেলা ভার
আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেব।
কালো গাইয়ের দুধ দেব, দুধ খাওয়ার বাটি দেব।
সোনার থালে ভাত দেব, রাজার মেয়ে বিয়ে দেব।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

ছড়াগুলি শিশু সাহিত্য। তা মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়াপাত। ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধহীন কতকগুলি অসংলগ্ন ছবিই এই ছড়াগুলির উপজীব্য। তাই কখনো তাঁতির বাড়ির ব্যাঙের বাসা কখনো বা মাঠে ডিম পাড়া হাট্টিমাটিমটিম, কখনও পানকৌটি আবার কখনও ফিঙে পাখি সেখানে স্বচ্ছন্দে জায়গা করে নিতে পারে। শেয়ালের নৃত্য কিম্বা বাদুড়ের বিয়ের আসরও সেখানে বাঁধা পড়ে ছন্দের বাঁধনে।

তাঁতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না।

হাট্টিমাটিমটিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো সিং তারা হাট্টিমাটিমটিম।

পানকৌটি পানকৌটি ডাঙায় ওঠসে
তোমার শাশুড়ী বলে গিয়েছে বেগুন কোট সে।
ও বেগুনটি কুটনা বীজ রেখেছে।
ও দুয়ারে যেয়ো না বন্ধু এসেছে।
বন্ধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে
ভাব ভাব কদমের ফুলফুটে উঠেছে।

ফিঙফিঙেটি বাবুই হাটি কোনখানে তোর বাসা?
আমার দাদুর বিয়ে হবে বৌটি হবে খাসা।

বাঁশ বাগানের কাছে
ভুঁড়ো শিয়ালি নাচে।
তার গোঁফ জোড়াটি পাকা
তার মাথায় কনক চাঁপা।

একযে আছে শিয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল,
তার মা ভাজছে মুড়ি
শিয়াল দিচ্ছে গড়াগড়ি।।

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে।
টোপর মাথায় দে।
চামচিকিতে বাজনা বাজায়
খেংরা কাঠি দে।

কোন কোন ছড়ায় রূপ পেয়েছে পল্লী বাংলার সমাজ জীবনের ছবি, যে সমাজে মাসি পিসির আদর বেশী; যে সমাজ জীবনে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বর্গী আক্রমন প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধির দ্বারা পীড়িত।

মাসি পিসি বনকাপিসি বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলে নাকো মোয়াটা ধর।

মায়ের বোন মাসি
কাদায় ফেলে থাসি
বাবার বোন পিসি,
ভাত কাপড়ে পুষি।

দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে যখনি নিয়ে যাবে তখনি।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিনকন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন। এক কন্যে খান
এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ি যান।

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ি সংসার কাঁদিয়ে

মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে
সেই যে মা পালাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবার বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজিয়ে। (সংক্ষেপিত)

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়ল বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে
ধান ফুরুল পান ফুরুল খাজনার উপায় কী
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

নিছক ছেলে ভুলানোর কাজে ব্যাপৃত না থেকে ভাবের ঘরে সিঁধ কাটে কোন ছড়া - ঘটায় ভাব ও ভাবনায় মণিকাঞ্চন সংযোগ। ছড়ার থেকে তখন খুঁজে পাওয়া যায় মানুষ গড়ার উপাদান, দেশগড়ার উপাচার -

লেখা পড়া করে সেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ কর।
তার বেলা?
ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেল গাড়ী
তারবেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যে হরির - লুট।
তারবেলা? (সংক্ষেপিত)

তবু ছড়া কেবল ছড়া মাত্র। তা দুঃখ ভোলানোর যাদুদন্ড, চিরন্তন সৌন্দর্যের আকর। তার করস্পর্শে বার্ধক্যে ও অনুভূত হয় শৈশবের হাতছানি, প্রাত্যহিকতায় ক্ষতবিক্ষত মন স্বস্তির পায় প্রলেপ। কর্ম মুখর প্রৌঢ়ত্ব কিংবা ধূসর বাধর্ক্যে উপনীত হয়েও তবু শুদ্ধ স্বরে কানপাতলে শোনা যায় অতীতের সেই ফেলে আসা দিনগুলোর গুঞ্জন -

আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর।
কি করবি কর
মাথা কুঁড়ে মর।

ছি ছি ছি রানি রাঁধতে শেখে নি
শুক্তুনিতে ঝাল দিয়েছে
অম্বলেতে ঘি।
পরমান্ন রেঁধে বলে ফ্যান ঝরাবো কী
ছি ছি ছি রানি রাঁধতে শেখে নি।

আমার কথাটা ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো।
কেনরে নটে মুড়োলি? গরুতে কেন খায়?
কেনরে গরু খাস? রাখাল কেন চড়াস না?
কেনরে রাখাল চড়াস না? বউ কেন ভাত দেয় না?
কেনরে বউ ভাত দিস না?
কলাগাছ কেন পাতা ফেলে না?
কেনরে কলাগাছ পাতা ফেলিস্ না? জল কেন হয় না?
কেনরে জল হোস্ না? ব্যাঙ কেন ডাকে না?
কেনরে ব্যাঙ ডাকিস না? সাপে কেন খায়?
কেনরে সাপ খাস?
খাবার ধন খাব নি? গুড়গুড়িতে যাব নি?

গাজন

সৌরভ গাঙ্গুলী

শ্রেণী দ্বাদশ

পারাজ স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ - কোলকোল গ্রাম। তবে এই গ্রামের সাথে জড়িয়ে আছে বাবা বুড়োশিব (বিদ্বেশ্বর) এর গাজন উৎসবের মাহাত্ম্য। ২২ শে চৈত্র হতে ৩০ শে চৈত্র পর্যন্ত চলে এই গাজন উৎসব।

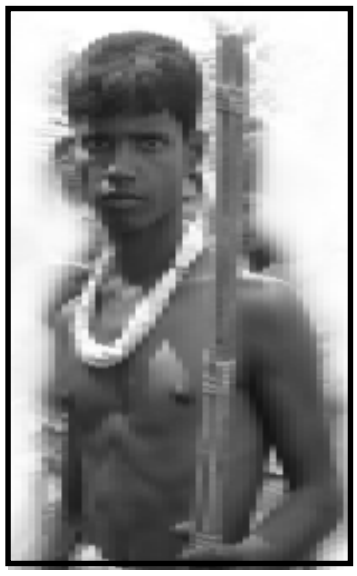

কথিত আছে, পুকুরের মাটি খনন করার সময় কোদালের আঘাতে উঠে আসে বাবা বুড়োশিবের শিবলিঙ্গটি। কোদালের আঘাতে তা দুটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে গেলেও পরে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত পুরোহিত মশায় রূপোর পৈতা দ্বারা সেই দুই খন্ডকে বেঁধে জোড়া দেন। প্রতি বছর এই দশদিন নিয়ম করে বাবা মহাদেবের পূজা করা হয়। এই গাজন উৎসবে প্রায় ১২ জন গ্রামবাসী এবং বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক মানুষ সন্ন্যাসী হন। তারা এই দশদিন শিবগোত্র ধারণ করে বাবা মহাদেবের সেবাইত হন। ২২ শে চৈত্রের দুপুরবেলায় ঘট বসে এবং সেই দিন থেকে বাবা মহাদেবের গাজন উৎসব শুরু হয় ঢাক বাজিয়ে। ২৬ শে চৈত্র সন্ন্যাসীরা শিবগোত্র ধারণ করেন। ২৭শে চৈত্র এবং ২৮শে চৈত্র সন্ধ্যাবেলায় চলে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরে বাবা মহাদেবের পূজা। রাতের বেলায় সেই দিনই হয় ধুমোসেবা। বাঁশের খুঁটিতে পা দুটি উপরে এবং মাথা নীচে করে আগুনের যজ্ঞে ফুল নিবেদন করেন প্রতিটি সন্ন্যাসী। ২৯ শে চৈত্রের দিন হয় সমস্ত সন্ন্যাসীর নির্জলা উপবাস। সেইদিন দুপুরে বাবা মহাদেবের ভোগ নিবেদন হয়ে যাওয়ার পর একটি পদ্মফুলকে নামাবলীর মধ্যে বেঁধে বাবা মহাদেবের মাথায় চাপানো হয়। বিকেল ৫ টার সময় বাবা মহাদেবের মন্দির চত্বরে সমগ্র গ্রামবাসী ও তাদের বহু আত্মীয় স্বজন এসে ভিড় করে বাবা মহাদেবের যাত্রায় শামিল হতে। সেই পদ্মফুল নিয়ে বাবা মহাদেবের বানেশ্বরে বেঁধে দশটি ঢাক ও খোল খঞ্জনি বাজিয়ে মন্দির চত্বর সাতবার প্রদক্ষিণ করে আস্তে আস্তে গ্রামের শেষ প্রান্তে খরী নদীতে যায়। সেখানে পূজা হওয়ার পর সন্ধে বেলায় স্থানীয় আশ্রমে বাবা মহাদেবের বিশ্রামস্থলে ফিরে আসে। সেইদিন রাত দশটার পর হয় বান ফোঁড়া উৎসব। মোটা বান কেউ জিভের উপরের অংশে, কেউ পেটের চামড়ায় ফুঁড়ে গান-বাজনার সাথে নাচ করে। নীলের পূজার দিনেই হয় এই রাতগাজন। পরেরদিন ৩০ শে চৈত্র হয় সন্ন্যাসীদের নিয়মভঙ্গ। সেইদিন রাত্রে হয় যাত্রাপালা। এছাড়া চারদিন ব্যাপী সিনেমা হওয়ার রীতি আছে। বহু আত্মীয়-স্বজনের যেমন সমাগম হয় এই গাজন উৎসব ঘিরে, তেমনি বহু খাবারের দোকান, খেলনার দোকানও বসে। এই গাজন উৎসবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এসে আনন্দে শামিল হয়, ফলে এই উৎসব সম্প্রীতির বার্তাও বহন করে।

"I know not what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble on a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me."

– Sir Isaac Newton

কল্পবিজ্ঞান

রাহুল ও নীলাদ্রির সমান্তরাল বিশ্বে একটি অ্যাডভেঞ্চার

সোহম সেন
শ্রেণী দশম

(১)

নিউক্লিয়ার ওয়ারে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে তা প্রায় 3000 বছর হয়ে গেল। যারা বেঁচেছিল বিজ্ঞানীদের কল্যাণে তারা নিকটতম বাসযোগ্য গ্রহ কেপটিলা 30C -র নক্ষত্র এস্টোমিটাতে আশ্রয় নেয়। গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে। বর্তমান বছর 5519 খ্রিস্টাব্দ। এই কয়েকহাজার বছরে মানুষ অভিযোজিত হয়ে আরও বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম 'হোমো সেপিয়েনটাটিস'। এই আধুনিক মানুষের কাছে অবশ্য পৃথিবী বা সোলার সিস্টেমের কোন অস্তিত্ব জানা নেই। উন্নত এই মানুষেরা জানে না মৃত্যু কি, কারণ অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় তারা এখন অমর। হাইপারস্পেস মেসিনের রহস্য আয়ত্ব ও আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। এই গ্রহের একটি দেশ স্টিপেনস্‌রো। এখানেই বসবাস করে অধিকাংশ মানুষ।

(২)

স্টিফেনস্‌রো স্কুলের একঘেয়ে জীবনে রাহুল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সব সময়ই সে একটু অবসর চাইছিল। হঠাৎই রাহুল একদিন মায়ের কাছে বায়না ধরল ''মা, মা, আমি এবারের ছুটিতে বেড়াতে যাবো'' মা সম্মতি জানালেন, ''ঠিক আছে। তবে যাবিটা কোথায়?'' ''আমাদের বিশ্বের সমান্তরাল বিশ্বতে? না, ওখানে তোর যাওয়া হবে না। মনে নেই গতবার কী বিপদ করেছিল। অ্যাক্সিডেন্টে মাথাটা তোর বাদই পড়েছিল প্রায়। ভাগ্যে সময় মতো জুড়ে দেওয়া গেছিল।'' রাহুল বায়না ধরল ''না, আমি যাবোই এবং যাওয়ার জন্য হাইপারস্পেস মেসিন সপ্তাহের মধ্যেই বানিয়ে ফেলবো। হাইপার স্পেস মেসিন তৈরীর যন্ত্রপাতি সে নিকটবর্তী Sicence Shop থেকে কিনে আনল। ছেলের বায়নারা কাছে শেষ পর্যন্ত মাকে হারতেই হল। মা অবশ্য জিজ্ঞাসা করল, ''কাউকে সঙ্গে নিবিনা? একা যাওয়াটা ঠিক নয়।'' ''বুঝলে, নীলাদ্রি আসবে। ওর সাথেই বেরোবো''। মা-ও আর না করল না।

মোটামুটি একসপ্তাহের মধ্যেই ফিজিক্সে তুখড় রাহুল একটা হাইপারস্পেস মেসিন বানিয়ে ফেলল। খবর পেয়ে পরের দিনই নীলাদ্রি এলো। প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র নিয়ে নীলাদ্রি আসার দুদিন পরেই রাহুল ও নীলাদ্রি টাইম মেশিনে চেপে রওনা দিল। অবশ্য রাহুল একটা টাইম মেশিনও সঙ্গে নিতে ভুলল না। কেপটিলার বায়ুমন্ডল ছাড়ার পর তাদের হাইপার স্পেস মেশিনটার গতিবেগ গিয়ে দাঁড়াল এককোটি কিমি / সেকেন্ড এ। কয়েকদিন চলার পরই তারা একটা ব্ল্যাকহোল দেখতে পেল। ''হ্যাঁরে, রাহুল এই ব্ল্যাকহোলটাই তো?'' ''বুঝলি নীলাদ্রি মনে হচ্ছে, এটাই সেই ফিফথ ভায়ামেনশনাল ব্ল্যাক হোল। চল আপাতত ঢুকে পড়া যাক। দেখাই যাক না কী হয়? সমান্তরাল বিশ্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রাহুল ও নীলাদ্রি প্রবেশ করল ঐ ব্ল্যাকহোল রিঙের মধ্যে (ব্ল্যাকহোল মধ্যবর্তী শূন্যস্থান) এবং পৌঁছে গেল ব্ল্যাকহোলটির অপর প্রান্তে।

(৩)

''বুঝলি নীলাদ্রি মাথাটা বড্ড ঘুরছে। মনে হচ্ছে ব্ল্যাকহোলটার মাধ্যাকর্ষণীয় আকর্ষণের জন্য এটা হচ্ছে।'' একটু নিস্তব্ধতার পর জিমি হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, ''রাহুল দ্যাখ পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী কিরকম অন্যরকম লাগছে না রে। দ্যাখ গ্রহগুলো নক্ষত্রটার চারপাশে কী রকম যেন জিগ্‌জ্যাগ পথে ঘুরছে।'' ''তাই তো রে! চ, একটা প্ল্যানেটে নামা যাক''। তবে তারা এগোতে পারল না। যত এগোতে চেষ্টা করছিল তত পিছিয়ে যাচ্ছিল এবং একসময় গতিবেগের এই হেরফের ঘটাতে তারা ছিটকে গেল ও তাদের মেশিনটা একটা গ্রহের উপর এসে থামল। তারা ঐ প্ল্যানেটে নামবার চেষ্টা করল কিন্তু নামতে পারল না। ''নীলাদ্রি, মেশিনটাকে প্ল্যানেটটায় নামানো যাচ্ছে না, বরং নামাতে গেল আবার যেন টাইমমেশিনটা আগের জায়গায় উঠে যাচ্ছে''। নীলাদ্রি কিছুটা আন্দাজ করতে পারল যে তারা অ্যান্টিম্যাটারে তৈরী বিশ্বে এসে পড়েছে এবং সে এটাও বুঝল মাধ্যাকর্ষণ বল তাদের আকর্ষণের বদলে বিকর্ষণ করছিল। ''রাহুল মেশিনটা থেকে একটা মেটালের বল ছোঁড় তো।''মেটালের বলটা ছুঁড়তেই সেটা উড়ে গেল। ''বুঝলি আমাদের এখানে নামাটা ঠিক হবে না। এই বিশ্বটা অ্যান্টিম্যাটারে তৈরী। টাইমমেশিনের প্রোটেকশন্ থাকায় ওটার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমরা ম্যাটারে তৈরী তাই নামলে কী হবে আন্দাজ করতে পারছিস?'' তাই ঝুঁকি না নিয়ে তারা ফিরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র কাজ করছিল না। তারা যতই এগোনোর চেষ্টা করছিল তত পিছিয়ে যাচ্ছিল। তাই রাহুল

একটা বুদ্ধি করল। সে টাইমমেশিনটাকে উল্টোদিকে চালাল এবং আশ্চর্যভাবে তারা অপর একটা ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে গেলো ও প্রবেশ করল আরেকটা ব্ল্যাকহোলের রিঙের মধ্যে।

(৪)

এরপর তারা অপর এক বিশ্বে পৌঁছাল। এই সমান্তরাল বিশ্ব তাদের বিশ্ব যে নয় ক্ষণিকের মধ্যে এটা আন্দাজ করতে খুব একটা অসুবিধা রাহুলের হয়নি। ধারণা করাটা একেবারে অমূলক নয়। কারণ রাহুল দেখল নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহগুলো অস্বাভাবিক গতিতে ঘুরে একা পূর্ণঘূর্ণন সম্পন্ন করেছিল এবং একটা নক্ষত্র গ্যালাক্সির কক্ষপথেও অস্বাভাবিক বেগে ঘুরছিল। অদ্ভুত এক বাঁধায় তারা জড়িয়ে পড়েছিল। এদিকে দুটো ব্ল্যাকহোলের মধ্যদিয়ে অতিরিক্ত বেগে যাওয়ার জন্য টাইমমেশিনের ইঞ্জিনও বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। ইঞ্জিনটা ঠান্ডা করার জন্য তারা একটা গ্রহে নামতে গেল। 'বুম্ - ম্ - ম্' - হঠাৎ এক জোর শব্দ হাইপার স্পেসে। ''কী হলরে রাহুল?'' ''বুঝলি নীলাদ্রি মনে হচ্ছে মেশিনটা বিগড়েছে। সম্ভবত কয়েকটা নাট আলগা হয়ে যাওয়ার জন্যই একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে''। তারা গিয়ে একটা গ্রহে আছড়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে রাহুল ও নীলাদ্রি তাদের টাইমমেশিন থেকে বেরিয়ে এলো। স্পেস কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর রাহুল ও নীলাদ্রি তাদের মেশিনটা ঠেলে চমকে উঠল - ''দেখ কী রকম লম্বা গলার অথচ ছোটো হাতপাওয়ালা প্রাণীগুলো গায়ে গায়ে ছুটে আসছে''। 'মনে হচ্ছে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে'। কিছু পরেই তারা দেখল যে প্রায় 200 ফুট লম্বা একটা দানব তাদের পিছনে ছুটে আসছে। তারাও পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করল। তবে তাদের চিন্তা ছিল হাইপারস্পেস মেশিনটা নিয়ে। রাহুল বললো, ''নীলাদ্রি আমাদের H_2 Recycling Machine - এ খোঁজতো এখানে কোথাও জল পাওয়া যায় কি না। কারণ এক দু লিটার জল লাগবে মেশিনটাকেই ঠান্ডা করতে।'' মেশিনটা থেকে জানা গেল উত্তরে প্রায় 2km দূরে একটা জলের জায়গা আছে। তাই সময় নষ্ট না করে নীলাদ্রি একটা জলের বোতল ও লেসার গান নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। পথে তার কয়েকটা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হল। এখানকার এক প্রজাতির একটি প্রাণী সে দেখল যারা দু মিনিটের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারছিল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জীবন চক্র তাদের সম্পূর্ণ হচ্ছিল এবং তারা মারা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সে রওনা দিল। ''এইতো এখানেই জল রয়েছে। কিছুটা তুলে নি।'' তবে জল ভরার পরই ঘটল বিপত্তি। হঠাৎ তার পিছন দিকে মাটি ফুঁড়ে এক কেঁচোর মতো দেখতে দৈত্যাকার জন্তু বেরিয়ে এলো। নীলাদ্রি তখন তার লেসার গানটা নিয়ে কয়েকটা ফায়ার করল। উলটে জন্তুটার আকার আরো বেড়ে গেল। সে আরেকটা ফায়ার করতে যাবে এমন সময় তার হাত থেকে বোতলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল প্রাণীটার পায়ে। অমনি সেটা আকারে অর্ধেক হয়ে গেল। তখন নীলাদ্রি আরো কয়েক বোতল জল নিয়ে প্রাণীটার পায়ে ঢালতেই সেটা ছোট হতে হতে একটা সময়ে আর সে সেটা দেখতে পেল না। এরপর নীলাদ্রি জল ভর্তি করে জলের বোতলটা নিয়ে ফিরল রাহুলের কাছে। মেশিনটাকে ঠান্ডা করার পরের দু-তিন ঘন্টার মধ্যেই হাইপারস্পেস মেশিনটা রাহুল ঠিক করে ফেলল এবং ঐ গ্রহটার অ্যাটমোস্ফিয়ার ছাড়ল। কিন্তু এখন তারা ব্ল্যাকহোলে ঢুকলো না। একটা ওয়ার্ম-হোল খুঁজল এবং ওয়ার্ম হোলটার ভেতরে ঢুকে টেলিপোর্ট করল নিজের বিশ্বে। তবে টেলিপোর্ট করার জন্য টাইমের গোলমালেতে তারা যেন কিছুটা অতীতে পৌঁচ্ছে গেছিল। এই সমস্যা থেকে তারা মুক্তি চটপট পেল। রাহুলের নিজস্ব টাইম মেশিনের সময়টা বেশ কয়েকবার কোটি বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এবং তারা ফিরে এলে তাদের বর্তমান বিশ্বে। এরপর তারা নিজের গ্রহে ফিরল। নির্বিঘ্নে রাহুল ও নীলাদ্রি ফিরে এসেছে দেখে মা খুব খুশি হল। তবে তারা ঠিক করল প্যারালাল গ্যালাক্সিতে আর যাত্রা নয়, এবার ঘুরলে তাদের নিজের গ্যালাক্সিতেই।

ছবি ঃ স্টাডি অব্ থ্রি হ্যাণ্ডস
শিল্পী ঃ অ্যালব্রেক্ট ড্যুয়েরার

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য

দেবাঞ্জন রায়
শ্রেণী দশম

‘‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’’ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর আমরাও রাতের আকাশে দেখি হাজার হাজার আলোক বিন্দু - তাদের কেউ উজ্জ্বল, কেউ বা অনুজ্জ্বল। রাতের এই তারকা খচিত আকাশ সম্পর্কে কৌতুহলের অবসান ঘটাতেই জন্ম নেয় বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার, যার নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) — যার সূত্রে জানতে পেরেছি সীমাহীন এই মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, নীহারিকার কথা। কিন্তু এসবের সৃষ্টি হল কীভাবে?

এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে - আদিতে এসবের কিছুই ছিল না। চারিদিকে বিরাজ করত শুধু কালো আর গাঢ় অন্ধকার। ছিল জমাট বাঁধা এক শক্তি। যার আকৃতি ছিল একটি কণার মতো আর আয়তন ছিল শূণ্য। এই অতি ক্ষুদ্র কণার মধ্যেই বীজ আকারে ছিল বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় উপাদান। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় মহাডিম্ব (Cosmic egg)। তবে এই মহাডিম্বের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল বা এত শক্তি কোথা থেকে এল - এসব প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর কিন্তু এখনও অজানা।

এরপর বিখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে মহাশূণ্যে ঘটেছিল এক মহা বিস্ফোরণ। আর এই বিং ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণ থেকেই শুরু হয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই বিস্ফোরণের পর তৈরী হয় প্রচন্ড উত্তাপ। সেই সঙ্গে ফুলে ফেঁপে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড বীজটি। বিস্ফোরণের ঠিক পরেই যে ব্রহ্মাণ্ডটি তৈরী হয়েছিল তা কত বড় এখনও জানা যায় নি। তবে উষ্ণতা কমার সাথে সাথেই ব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতি কমে আসে। আর তার সাথে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাস সহ আরও নানা রকম গ্যাস, গ্যাসীয় মেঘমালা, আর সেখান থেকে জন্ম নেয় নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি (Galaxy)।

বর্তমানে খুঁজে পাওয়া প্রায় দশ হাজার কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি তার নাম ‘আকাশ গঙ্গা’ (milky way)। এই গ্যালাক্সি ও তৈরী হয় ওই মহা বিস্ফোরণ থেকে। আমরা রয়েছি গ্যালাক্সির এক ধারে। এর কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব 30,000 আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সির দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য ও একটি নক্ষত্র। তবে আকারে ঔজ্জ্বল্যে এটি অতি সাধারণ মানের তারা। এছাড়াও আছে দুটি উপগ্যালাক্সি (Satellite Galaxy), যাদের বলা হয় ম্যাজিলানিক ক্লাউড। আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী গ্যালাক্সি হল ‘অ্যানড্রোমিজ’। ব্রহ্মাণ্ডের এই চিত্র অনুধাবন করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘বিস্ময়ে তাই জাগে গান।”

॥৩॥

‘‘হে শ্রমজীবী শ্রেণী, আমরা হাত প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আমরা তোমাদেরই -
আমাদের মিলিত হইতে দাও। আমাদের মধ্যকার বিভেদ ঘুচিয়া যাক। সমগ্র মানবজাতি
আজ বিপন্ন!’’ — রম্যাঁ রল্যাঁ

অসম্ভব

চৌধুরী মহম্মদ রাকিব
শ্রেনী একাদশ

(১)

ঘুম ঘুম চোখে সুদর্শনবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন, আর তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ছ'টা থেকে তাঁদের আড্ডা শুরু হবে। ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়েই তার সাধের ইন্ডিকা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আজ গাড়ি চালাতে চালাতে পুরানো কথা মনে পড়ছে তাঁর। তাঁর গ্রামের কথা, গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা আম চুরির কথা। বন্ধুরা মিলে পাশের গ্রামে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। কেমন করে সব যেন বদলে গেল। মাধ্যমিক পাশ করতেই তাঁর বাবা মারা গেলেন আর সংসারের সব দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল। একদিকে পড়াশোনার খরচ, অন্য দিকে মায়ের ঔষধ, বাড়ি ভাড়া। পুরো কলেজ লাইফটা তিনি চাষের বলদের মত খেটেছিলেন। তার ফলও তিনি এখন পাচ্ছেন, তিনি এখন শহরের খুব বড়লোকেদের মধ্যে একজন। তাঁর প্যাথোলজি সেন্টারের নাম অজ পাড়া গাঁ থেকে ডি. এম., জেলা পরিষদের মেম্বাররা পর্যন্ত জানেন। কিন্তু, হঠাৎ আজ তার এসব মনে হচ্ছে কেন?

(২)

সুদর্শনবাবু এখন হাসপাতালে, ও.টি.তে। জি.টি রোডে তাঁর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিশেরা এক মাঝবয়সী ছেলেকে জেরা করছে, সে নাকি সব দেখেছে। ''স্যার আমি যখন জি.টি রোডের পাশে এক চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা ইন্ডিকা, লাল রং-এর, জোরে ছুটে আসছে। আর তখনই হঠাৎ একটা লরিও পাশের রাস্তা থেকে উঠে এসেছে। গাড়ির ড্রাইভার যতদূর সম্ভব নেশা করেছিল। কেমন এঁকে বেকে চালাচ্ছিল আর চালাচ্ছিলও খুব জোরে। হঠাৎ করে মোড় থেকে লরিটা উঠে আসায়, ইন্ডিকাটা ব্রেক কষার টাইম পায়নি মনে হয়। একেবারে সোজা গিয়ে লরির তলায় ঢুকে গেল। গাড়িটা দুমড়ে মুচরে একেবারে শেষ হয়ে গেল। তার পরের ঘটনাটা আপনি তো জানেন স্যার।

লরির ড্রাইভারটাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লোকটা একেবারে যাচ্ছেতাই ভাবে নেশা করেছিল।

(৩)

আজ দু মাস হল সুদর্শনবাবুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টে তিনি হাতের, পায়ের আর কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছেন। সেদিন সুদর্শন বাবু পুরানো চিন্তাতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, লরিটাকে তিনি দেখতেই পাননি।

এখন সারা দিনই বিছানায় পড়ে থাকেন তিনি। মাথার পাশে তাঁর স্ত্রী যামিনী। তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে আমেরিকায়, একবার এসেছিল বাবার সাথে দেখা করতে, আবার চলে গেছে। সুদর্শনবাবু বিছানায় পড়ে থাকলে কি হবে, একদম ঘুমোন না। চেয়ে চেয়ে সব দেখেন, আর নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে চোখ দিয়ে জল ফেলেন।

(৪)

দু দিন পরের কথা, সকালবেলায় দরজায় বেলের আওয়াজ শুনে যামিনী, দরজা খুলে দেখেন তাদের জামাই সুব্রত এসেছে।

''এসো বাবা, কেমন আছো?''

''ভালো আছি মা। বাবা এখন কেমন আছেন? রিমি এসেছিল কিন্তু একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় সেদিন আর আমি আসতে পারি নি। কালকেই ফ্লাইট ধরে চলে এলাম। শুনলাম বাবা আর কথা বলতে পারেন না?''

সুদর্শন বাবু সব শুনছেন, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। তার মনের ভেতরটা কেমন কেঁদে উঠছে। তাঁর আজকে খুব কথা বলতে ইচ্ছা করছে, খু-উ-ব ইচ্ছা করছে। যামিনী বলতে শুরু করলেন, ''এসো বাবা, বোসো''। সুব্রত একটা সোফায় বসল। যামিনী আবার বলতে শুরু করলেন, ''শুধু কি কথা বলার ক্ষমতা? ও হাঁটতেও পারে না, আবার হাত দুটোও নষ্ট হয়ে গেছে। চোখের সামনে সকালবেলায় গাড়ি নিয়ে বেরোলো, ফিরল.....'' সুদর্শন বাবুর স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ''বোসো বাবা, আমি তোমার জন্য চা করে আনি।'' যামিনী রান্না ঘরে ঢুকলেন। সুব্রত আস্তে আস্তে উঠে সুদর্শন বাবুর পায়ের কাছে এসে বসল। সুদর্শন বাবুর হাতটা ধরে বলল,''বাবা, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, দেখবেন। আমি আপনাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবো, যে কোন উপায়ে সুস্থ করে তুলব আপনাকে।''

(৫)

সুব্রত এই একটু হল বেরিয়েছে। কী একটা কাজ সেরে বিকেলে আসবে আর সুদর্শন বাবু ও যামিনীকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে।

যামিনী স্যুটকেশ গোচাচ্ছে। সুদর্শন বাবুর মাথাটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠল। আস্তে আস্তে খুব ব্যথা হতে লাগল মাথায়। চোখগুলো জড়িয়ে আসছে। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। হঠাৎ, তিনি দেখতে পেলেন একটা বড় গাড়ি ছুটছে। ভেতরের চালকটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে সুদর্শনবাবুর। চালকটা সুব্রত, হঠাৎ সুব্রতর ফোন বেজে উঠল। ফোনে কথা বলছে সুব্রত আর হঠাৎ ই একটা ছোট ছেলে রাস্তায় এসে পড়ল, ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটাকে জোরে ডানদিকে ঘোরালো সুব্রত, ব্রেক কষল চেপে, কিন্তু হায়! গাড়িটা যেয়ে ধাক্কা মারল পাশে ছুটে আসা একটা লরিকে। তিনবার পাল্টি খেল সুব্রতর গাড়ি। গাড়িটা খেলনার মত ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে সুব্রতর রক্তাক্ত মাথাটা বেরিয়ে এল।

(৬)

সুব্রত মারা গেছে খবরটা এল পরদিন সকালে। যামিনী কাঁদতে কাঁদতে সুদর্শন বাবুকে বললেন, ‘‘ঈশ্বরের এ কী অভিশাপ? আমরা তার কী করেছিলাম যে তিনি আমাদের এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন? সুব্রততো কম বয়সি ছেলে, তাকে কেন ঈশ্বর নিল? তার আগে আমাকে কেন নিয়ে নিল না?”

সুদর্শন বাবু ঘামতে শুরু করেছেন। সুব্রত কেমন করে মারা গেছে তা তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে সুব্রত মারা যাবে! জানতে পেরেও তিনি কিছু করতে পারছেন না, কারণ তিনি যে এক অসহায় পঙ্গু। তাঁর পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয় তো কি করে তিনি বোঝাবেন?

(৭)

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল কিছুদিন পরেই। সুদর্শন বাবুর মাথাটা আবার ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তিনি দেখতে পেলেন- একটা বড় ঘর, অনেক আসবাবপত্র। একটা টেবিলে তার মেয়ে রিমি দাঁড়িয়ে আছে, গলায় দড়ি বাঁধা, ফ্যানের সঙ্গে। কাঁদছে, রিমি কাঁদছে। হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে পায়ে করে টেবিলটাকে সরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্। তারপরেই ঘুমিয়ে গেল তাদের মেয়ে চিরদিনের জন্য।

(৮)

রিমির মৃত্যুর খবরটা এল দু’দিন পর। যামিনী একেবারে ভেঙে পড়েছে। কিছু খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, শুধু কাঁদছে। কেঁদেই যাচ্ছে রিমির ছোটবেলাকার ফটোটা বুকে জড়িয়ে ধরে।

সুদর্শনবাবুও ভেঙে পড়েছেন। তবে সেটা কেউ বুঝতে পারছে না, সুদর্শনবাবুও বুঝতে দিচ্ছেন না। চোখ বন্ধ করে তিনি ভাবছেন, তার মেয়ের মৃত্যুটাও তিনি দেখলেন। তার মেয়ে আমেরিকায় গলায় দড়ি দিল অথচ সুদর্শন বাবু বর্ধমানের এক মাঝারি মাপের ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে সব দেখতে পেলেন অথচ কাউকে জানাতে পারলেন না। কারণ তিনি যে অসহায় পঙ্গু।

(৯)

কিছুদিন যেতে না যেতেই, আবার সুদর্শন বাবু স্বপ্ন দেখলেন - একটা বড় ফ্ল্যাট বাড়ি। বাড়িটাতে আগুন লেগেছে। চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। অনেকক্ষণ বাদে আগুন নেভানো হল। দুটো লাশকে বার করে আনছে একজন। একটা লাশ সুদর্শনবাবুর আর একটা যামিনীর।

সুদর্শনবাবু চোখ খুললেন। তিনি জানেন যে উনি আর তার স্ত্রী তক্ষুনি মারা যাবেন অথচ তিনি কোনভাবেই নিজেকে অথবা নিজের স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবেন না, কারণ তিনি যে অসহায় পঙ্গু, বোবা।

“Some books are to be tasted, others to be swallowed,
and some few to be chewed and digested.”
– Francis Bacon

আত্মত্যাগ

মননেন্দু দাস
শ্রেণী দশম

সালটা ৩০১৬। নাসার গবেষণাগারে প্রচন্ড তোড়জোড় চলছে। ভয়েজার ১১১১ পাঠাতে হবে যে! তাই সমস্ত পৃথিবীর মহান বিজ্ঞানীরা চার'শ বছর ধরে প্রচন্ড পরিশ্রম করছেন, তারই সুফল মিলতে চলেছে ১৫ ই আগস্ট। হ্যাঁ, ঐ দিনই সুদূর বিরিঞ্চি নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অজীন নামক গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে ভয়েজার ১১১১। নাসার অধিকর্তারা এতদিনে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছেন। বহু বছরের নিদ্রাহীন পরিশ্রমের শেষে তাঁদের মুখে ফুটে উঠেছে এক চিলতে হাসি।

''যাক বাবাঃ,'' ডক্টর বেথুন মুখ খুললেন, ''বাঁচা গেল, এতদিনে এই মহাকাশযান তৈরী। আর ঘুরে বেড়ানোর জন্য সেই একই দিল্লী, লন্ডন, প্যারিস, মস্কো আর নয়। এবার সোজা গ্রহান্তরের দিকে।'' সবার মুখ সাফল্যের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একে অপরকে কোলাকুলি করলেন সবাই।

ডঃ বেথুন এই প্রোজেক্টের মহা পরিচালক। ডঃ রামোস সহ পরিচালক, এছাড়াও কারিগরি দিকটি সামলাচ্ছেন ডঃ অ্যালবার্ট ও ডঃ মাথুর। বেতার প্রেরণ ও গ্রহণ এর দায়িত্বে ডঃ হিউম ও ডঃ কুক। কিন্তু, তিনি? সেই ক্যাপ্টেন জয়দীপ বসু, যিনি এই প্রজেক্টে সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল তাঁর ঘরে। লেপের তলায় ঢুকে ঘরের এসি - ২৮১^{0}c তাপমাত্রায় চালিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছেন। ''আর কোন কাজ নেই, সাধে বলে বাঙালি ঘুমকাতুরে!'' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ডঃ মাথুর, ''আরে মশাই, এই সকালে সবাই আনন্দে মাতোয়ারা, আর আপনি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন? ও ডঃ বসু''। ''আশ্চর্য ঘুম মশাই'' ডঃ রামোস বললেন, ''একী ঘুম মশাই, হাজার ডাকেও ভাঙে না। দাঁড়ান মজা দেখাচ্ছি'' - বলে নিজের লেসার গানটা বের করে ঘুম ভাঙানি লেসার বেরোনোর বাটনটা টিপে ট্রিগার টিপে দিলেন।

ও হরি! ডঃ বসু যে ঘুমোননি, শুয়ে শুয়ে অ্যাকটিং করছেন, তা কে জানতো! রামোস লেসার গানের ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অত্যাধুনিক লেসার গানটার ট্রিগার টিপে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রামধনুর ঝলকানি। আলোর অদ্ভূত খেলায় এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হল সেখানে। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সবাই। তিন মিনিট পর আনন্দে ফেটে পড়লেন উপস্থিত সকলে। উপস্থিত প্রত্যেকে তাঁকে তাঁর এই আবিস্কারের জন্য অভিনন্দন জানালেন। যাইহোক পরবর্তী কয়েকটা দিন কেটে গেল হই হুল্লোরের মধ্যে।

তারপর ১৫ ই আগস্ট।

নাসার সমস্ত অধিকর্তা, বিজ্ঞানীদের করতালির মধ্যে অজীনের দিকে যাত্রা করল ভয়েজার ১১১১। প্রায় ১৫০০ আলোকবর্ষ যাওয়ার পর যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভয়েজার ১১১১ অবতরণ করল এক অজানা - অচেনা গ্রহে। তাঁরা মহাকাশযান থেকে নেমে তিনদিন ধরে সেই গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করলেন। হঠাৎ এক অদ্ভূত জীবের কবলে পড়ে গেলেন তাঁরা। সেই গ্রহের উপর প্রতিফলিত বেগুনি রঙের রোদের উপর ছুটতে ছুটতে সামনে এক গুহা দেখতে পেয়ে ঢুকে গেলেন তারা। বিশালকার সেই প্রাণী গুহার অপেক্ষাকৃত ছোটমুখ টাকে অনবরত ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে। তখন অন্যরা মিলিতভাবে ডঃ বসুকে ধরলেন, ''বসু, কিছু করুন''।

ভাবতে ভাবতে তিনি বললেন, ''দেখুন আমি একজনের জীবনের বদলে বাকী দু'জনের জীবন বাঁচাতে পারব''। মাথুর বললেন, ''আপনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত''। বসু বললেন, ''ব্যাপারটা আমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি''। তাঁর পকেটে এক প্যাকেট তাস ছিল। সেই তাস তিনি সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সবার থেকে উঁচু দরের তাসই পেলেন তিনি । তবুও সঙ্গীদের দেখে আবেগাপ্লুত হৃদয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিই অন্যদের বাঁচাবার দায়িত্ব নেবেন। তাই, কেউ কিছু বলার আগে বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে পিছু ধাওয়া করল ঐ জন্তুটা। ফলে গুহা থেকে বেরোবার আর কোন বাধা রইল না। অন্যরা তখন মহাকাশযানটায় উঠে মহাকাশাভিমুখে গমন করলেন। যেতে যেতে দেখলেন, মহান বিজ্ঞানী বসুর দেহ ঐ জন্তুটা ছিঁড়ে ফেলেছে।

১১৮ দিন পর এক কনফারেন্স-এ ঐ দলের পরিচালক ডঃ বেথুন বলেন, ''ডঃ বসুর মত একজন মহান বিজ্ঞানী আমাদের সঙ্গে ছিলেন বলেই আজ আমরা পৃথিবীতে সুস্থ শরীরে। তাঁর সুমহান আত্মত্যাগ পরবর্তী সমস্ত প্রজন্ম অনুসরণ করবে। হে মহামানব, আপনাকে আমাদের শতকোটি প্রণাম।''

''সকল অলংকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা।''

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভ্রমণ কাহিনী

মরুভূমির দেশে

সৌরদ্বীপ রায়
শ্রেণী চতুর্থ

আমি এই বছর মার্চ মাসে রাজস্থানের যোধপুর, জয়সালমীর, মাউন্ট আবু, উদয়পুর, চিতোরগড়, আজমীর, পুষকর ও জয়পুর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। আমরা সপরিবারে মার্চ মাসের ৪ তারিখে রাত্রি ১২ টা ৩৮ মিনিটে যোধপুর এক্সপ্রেসে চেপে যোধপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ৬ই মার্চ সকাল ৭ঃ৩০ টায় যোধপুর স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে অটো করে হোটেল 'রমন প্যালেস' গেলাম। যোধপুর রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। যোধপুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি - মেহেরানগড় দুর্গ ও মান্তোর গার্ডেন দেখলাম। ১৪৫৯ সালে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাজপুতরাও যোধা মান্ডোর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মেহেরানগড় দুর্গে নিয়ে আসেন। কেল্লার মধ্যে আছে এক একটা মহল। বর্তমানে এই মহলগুলিই মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। সাজানো রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, পালকি, দোলনা, চেয়ার, ছবি, রাজা-রানির পোশাক, আসবাব পত্র, গয়না প্রভৃতি। সবথেকে উঁচুতলায় রয়েছে রাজার রাজ্যশাসনের ঘর। ঘরের দেওয়ালের ছাদের কারুকার্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দুর্গের ছাদে রয়েছে অসংখ্য কামান। তারপর আমরা মন্তোর গার্ডেন পৌঁছে একটি সুন্দর বাগান দেখতে পেলাম। এখানে রয়েছে রাজপরিবারের ছত্রি - একটা পাথরে খোদাই করা মূর্তি 'হল অফ ফেম'। এখানে একটা ছোটো মিউজিয়ামও আছে। এই বাগান দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে গাড়ি করে যোধপুরের আর একটা আকর্ষণীয় প্যালেস 'উমেদ ভবনে' গেলাম। ১৯২৯ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রাজা উমেদ সিং ইতালীর স্থাপত্য রীতিতে বেলেপাথর দিয়ে প্রাসাদটি তৈরী করেন। কয়েকটা ঘরে সাজানো আছে রাজাদের সংগ্রহের নানান জিনিস। মেহেরানগড় দুর্গের অদূরে রয়েছে সাদা মার্বেলের তৈরী স্মৃতিসৌধ যশবন্ত। ১৮৯৯ সালে মহারাজা দ্বিতীয় যশবন্ত সিং - এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সৌধ নির্মাণ করা হয়। যোধপুর থেকে ১১ কিমি দূরে আছে কায়লানা হ্রদ। এখানে বোটিং করা যায়। এরপর আমরা দুপুরে খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। ঐ দিন রাত্রি ১১.৩০ টায় যোধপুর জয়সালমীর এক্সপ্রেসে চেপে জয়সালমীরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তার পরেরদিন ভোর ৫.৩০ টায় জয়সালমীর স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে অটো করে হোটেল প্রিন্সে পৌঁছালাম। বর্ণময় জয়সালমীর শহরের প্রধান আকর্ষন 'সোনার কেল্লা' ও 'থর মরুভূমি'। ঐদিন সকালে আমরা গাড়ি করে প্রথমে গেলাম 'গাদিসার' লেকে। কথিত আছে গাদিসার লেকে গুপ্তস্থান দিয়ে এসে রানী স্নান করতেন। এই লেকের পাড়ে অনেক মন্দির আছে। তারপর আমরা ত্রিকূট পাহাড়ে সোনালী রঙে রাঙা 'সোনার কেল্লা'য় গিয়ে পৌঁছাই। এই কেল্লাটি হলুদ রঙের বেলেপাথর দিয়ে তৈরী। সেজন্য লোকে এটিকে সোনার কেল্লা বলে। এই নাম মুখে মুখে ভাসে 'সোনার কেল্লা' সিনেমার দৌলতে। দুর্গের মূল প্রবেশদ্বার পেরিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হয় এক এক করে। তারপর সুরজ পোল, গণেশ পোল, হাওয়া পোল অতিক্রম করে সিটি প্যালেসে যেতে হয়। সিটি প্যালেসেই দুর্গের প্রধান প্রাসাদ আছে — যা বর্তমানে মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। জয়শালা রাজাদের অতীত গৌরব সাজানো আছে এখানে। দুর্গের বাইরে আমরা দেখলাম পাথরের জাফরি কাটা 'পাটোয়া কি হাবেলি', 'সেলিম সিং কি হাবেলি'। কাঠ এবং পাথরের যুগলবন্দিতে এগুলিকে প্রাণবন্ত লাগে। প্রত্যেকটি হাবেলিই এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

বিকেল বেলা জয়শালমীরের প্রথম আকর্ষণ মরুভূমি দেখার জন্য রওনা হই। স্যামে যেতে যেতে দেখলাম গুপি গাইন বাঘাবাইন ও হিন্দি সিনেমা রুদালীর শুটিং স্পট। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে অমর সাগর। এখানে সুন্দর কারুকার্যময় জৈন মন্দির আছে। শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে স্যাম স্যান্ড ডিউনস্, যেখানে ছোট বড়ো বালির পাহাড় ও উটেদের দল বেঁধে সাওয়ারি নিয়ে যাওয়া দেখে লোককে মুগ্ধ হতে হয়। আমি উটের গাড়িতে চেপে পাহাড়ে উঠে সূর্যাস্ত দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। সেখান থেকে একটি রিসর্টে গিয়ে রাজস্থানী নাচ-গান দেখে

এবং রাজস্থানী খাবার খেয়ে রাতে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। তার পরদিন ৯-৩- ২০১০ রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে জয়সালমীর-যোধপুর এক্সপ্রেসে চেপে যোধপুর রওনা হই এবং ১০-০৩-২০১০ সকাল ৭.৩০ টায় যোধপুর স্টেশন থেকে সোমনাথ এক্সপ্রেসে (জম্মু - আমেদাবাদ) চেপে বেলা ১১ টায় আবু রোড স্টেশনে পৌঁছাই। দুপুরে হোটেল 'ভগবতী ইন্টারন্যাশনাল'-এ থেকে সরকারী বাসে করে আম্বাজি মন্দির যাই। মন্দিরের মার্বেল পাথরের কারুকার্য দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ১১ মার্চ রাজস্থানের একমাত্র শৈলশহর মাউন্ট আবুতে পৌঁছালাম। ১২২০ মিটার উচ্চতায় আরাবল্লী পাহাড়ের এই শহরের প্রাণ জুড়ে আছে নীল জলের নক্কি লেক। শহর থেকে ১১ কিমি দূরে আছে 'অচল গড়'। এখানে আছে অচলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেব মন্দিরের কাছে আছে মন্দাকিনী কুন্ড। সেখান থেকে আমরা ব্রহ্মাকুমারী ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়ালিটির প্রধান কার্যালয় 'ওম শান্তি ভবন'- এ যাই। ১৫০ ফুট পিলার বিহীন লম্বা হলঘরে প্রায় ৩, ৫০০ জন একসাথে বসে প্রার্থনা করতে পারে। এখানকার স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শহর থেকে ৩ কিমি দূরে আবু পাহাড়ের প্রধান আকর্ষণ শিল্পসমৃদ্ধ ওয়াড়া মন্দির। মূল মন্দিরে ঋষভদেবের মূর্তি আছে। আর লুনা বসাই মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছে নেমিনায়ের নামে। মন্দিরগুলো সর্বত্র মার্বেল পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভাস্কর্যে সাজানো। সেই সময় খরচ হয়েছিল আঠারো কোটি তিপান্ন লক্ষ টাকা। কথিত আছে এই মন্দিরের কারিগররা যাতে আর দ্বিতীয় একরকম মন্দির তৈরী করতে না পারে সেই জন্য তাদের হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল। ১৪ বছর ধরে ১৫০০ কারিগররা এই মন্দির তৈরী করেছিল।

শহর থেকে ১৮ কিমি দূরে আছে আবু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - গুরুশিখর। গুরু শিখরের চূড়ায় আছে শিব মন্দির এবং দত্তাত্রেয় মন্দির। দত্তাত্রেয় মুনির পাদুকা সযত্নে এখানে রাখা আছে। পাহাড়ের গুহায় বড়ো পাথর কেটে তৈরী হয়েছে অধরা-দেবীর মন্দির। ৩৬০ টি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় এই মন্দিরে। এখান থেকে খানিকটা দূরে সুসজ্জিত নক্কি লেকে বোটিং করা যায়। এখানকার শেষ দর্শনীয় স্থান সানসেট পয়েন্ট। আমরা এখান থেকে মনোরম সূর্যাস্ত দেখে সন্ধ্যে ৮-টার সময় হোটেলে ফিরেছিলাম।

মাউন্ট আবু থেকে ১২ ই মার্চ সকাল ৯.৩০ মিনিটের বাসে চেপে রওনা হই উদয়পুরের উদ্দেশ্যে। উদয়পুরে আমরা 'সাগর প্যালেসে' ছিলাম। উদয়পুরকে 'হোয়াইট সিটি' বলা হয় আবার 'লেক সিটি'-ও বলা হয়। রাজা উদয় সিং-এর নাম অনুসারে এই শহরের নাম হয়েছে উদয়পুর। ওখানে পৌঁছে দুপুরে আমরা সিটি প্যালেসে যাই। রাজস্থানে যে কটি প্রাসাদ আছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। প্রাসাদ তোরণের সঙ্গে আছে আটটি শ্বেত পাথরের প্রাঙ্গন, ঝুলন্ত বাগান, রাজমহল সহ অনেক কিছু। পিছলা লেকের ধারে এই প্রাসাদ তৈরী করেন মহারাজা উদয় সিং। প্রাসাদের মধ্যে অনেক মহল আছে। সেগুলি হল - শিশ্ মহল, দিলখুশা মহল, মোতি মহল, কৃষ্ণ মহল প্রভৃতি।

ফতে প্রকাশ প্যালেসে গড়ে উঠেছে ক্রিস্টাল গ্যালারি। পিছলা লেকের মাঝে সাদা প্রাসাদটি নির্মাণ করেন মহারানা দ্বিতীয় জগৎ সিং ১৭৪৬ সালে। জগদীশ মন্দির নির্মাণ করেন প্রথম জগৎ সিং ১৬২০ সালে। এই মন্দিরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি আছে। উদয়পুরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় চেতকে উপবিষ্ট মহারানা প্রতাপের মূর্তি আছে। এটি 'প্রতাপ স্মারক' নামে পরিচিত।

ফতে সাগর লেকটি খুব সুন্দর। এখানে বোটিং করা যায়। 'সহেলী কি বাড়ি' রাজ পরিবারের অবসর বিনোদনের স্থান। সুন্দর বাগানে সাজানো, চারিদিকে ফোয়ারা, বেশ ঠান্ডা জায়গা। সুখারিয়া সার্কেলে গোল করে পুরো জায়গাটা ভ্রমণ করতে হয়। 'লোক কলা মন্ডল' নামে উদয়পুরের হস্তকলা কেন্দ্রটি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। তারপরের দিন ১৩ই মার্চ সকালে রাজস্থানে ট্যুরিজিমের বাসে করে হলদি ঘাট, নাথদ্বারা একলিঙ্গজির মন্দিরের দর্শনে গিয়েছিলাম। হলদিঘাটে আকবর ও রানা প্রতাপের যুদ্ধস্থল, যুদ্ধের নানা ঘটনা মূর্তিতে, ছবিতে এবং মডেলে দেখা যায়। আর তার সঙ্গে আছে রাজস্থানের গ্রাম্য জীবন। বেশ বড়ো জায়গার উপরে এখানে একটি মিউজিয়ামও আছে। আকবর ও রানা প্রতাপের যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য মারা যায়। তাই এর নাম 'রক্তা তালাই'। এইসব দেখে আমরা যাই ৪৮ কিমি দূরে নাথদ্বারা মন্দিরে। এখানে আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ। নাথদ্বারা যে প্রাঙ্গনে তা দুর্গের মতো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দিরে পূজিত হন কালো পাথরের চতুর্ভুজ শিব। সব মিলিয়ে এই চত্বরে ১০৮ টির মত মন্দির আছে।

১৪ ই মার্চ সকালে ৭.৩০ টায় সরকারি বাসে করে চিতোরগড়ে যাই। ১০.৩০ টায় বাস থেকে নেমে 'ঋতুরাজ' হোটেলে যাই। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে চিতোরগড় দেখতে বের হই। চিতোরের মীরাবাঈ মন্দির অত্যন্ত আকর্ষনীয়। মন্দিরের ভেতর শ্বেত পাথরের তৈরী মীরাবাঈ ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখার মতো। সেখান থেকে একটু দূরে গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম।

তারপর দেখলাম বিজয়স্তম্ভ। গুজরাট ও মালওয়ারদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর রানাকুম্ভ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন একজন ধনী জৈন ব্যবসায়ী। এরপর দেখলাম রানাকুম্ভের প্রাসাদ। এই প্রাসাদেই পদ্মিনী সহ অন্যান্য রানীরা জহরব্রত পালন করেছিলেন। হ্রদের মাঝে রানী পদ্মিনী প্যালেস। এখানেই আয়নার মাধ্যমে পদ্মিনীর রূপ-সৌন্দর্য আলাউদ্দিন খিলজীকে দেখানো হয়েছিল। আলাউদ্দিন খিলজি পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পদ্মিনী সম্মান বিসর্জন দিয়ে খিলজিকে ধরা দেবেন না বলে আত্মহননের পথ বেছে

নেন।

চিতোরের প্রধান দ্রষ্টব্য দুর্গ ১৮০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ৭০০ একর জায়গা জুড়ে থাকা চিতোরের দুর্গ। ১৩০৩ সালে আলাউদ্দিন খিলজির নেতৃত্বে প্রথম আক্রান্ত হয় চিতোর।

চিতোরগড় থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে সরকারী বাসে ৯.৩০ মিনিটে আজমীরে পৌঁছালাম। রাত্রিটা হোটেল 'গুলাব প্যালেস'-এ কাটাই। পরের দিন ১৫ ই মার্চ সকালে আজমীর থেকে ১২ কিমি দূরে হিন্দুতীর্থ পুষ্করে যাই। এখানেই পৃথিবীর একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির। আজমীর ও পুষ্করকে বিভক্ত করেছে নাগপাহাড়। পুষ্করের অন্যতম আকর্ষণ হ্রদ ও তার পাড় জুড়ে অসংখ্য ঘাট। কথিত আছে ব্রহ্মার হাত থেকে পড়া পদ্মফুল থেকে জল নির্গত হয়ে যে হ্রদ তৈরী হয় তা-ই আজকের পুষ্কর। সাবিত্রী ঘাটে পুজো দিয়ে আমরা ব্রহ্মা মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। পথ থেকে লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। দ্বার রক্ষীদের চেকিং-এর পর চূড়ার ব্রহ্মা মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। গর্ভগৃহে রুপোর সিংহাসনে উপবিষ্ট লাল রঙের চতুর্মুখ ব্রহ্মা মূর্তি। বামপাশে গায়ত্রী দেবী। মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের উপরে আছে সাবিত্রী মন্দির। অপর পাহাড়ে আছে গায়ত্রী দেবীর মন্দির। ১০ টার মধ্যে আজমীরে ফিরে এসে একে একে আন্নাসাগর হ্রদ, দৌলতবাগ, লব-কুশ উদ্যান, আকবর ফোর্ট ও মিউজিয়াম দেখি। এগুলি দেখে আমরা আজমীরের প্রধান আকর্ষণ সুফি মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা দেখতে যাই। এটি ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান মুসলিম তীর্থকেন্দ্র। ইতিহাস প্রসিদ্ধ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি সুফি সন্ন্যাসী হয়ে এদেশে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর সেই বিশ্রামস্থল তীর্থক্ষেত্রে রূপ নেয়। প্রতি বছর সম্রাট আকবর এই দরগায় আসতেন। তাঁর স্মৃতি হয়ে আছে দরগার রুপোর দরজা। আকবর ও শাহজাহান একটা মসজিদও বানিয়ে নেন এখানে। ভিতরে ঢোকার আগে মাথায় কাপড় বেঁধে ঢুকতে হয়। প্রবেশপথের দু'পাশে দু'টি বিশাল হাঁড়ি আছে। ভিতরে মইনুদ্দিন চিস্তির সমাধি সাদা মার্বেলে তৈরী আর সোনার পাতে মোড়া। ভিতরের রেলিংও রুপোর। দরগার পাশেই আছে আড়াই দিন্ - কা - ঝোপড়া।

ঐ দিন বিকেল চারটের বাসে জয়পুর রওনা হই। রাজস্থানের রাজধানী আর দেশের বড়ো শহরগুলির মধ্যে অন্যতম জয়পুর। জয়পুর 'পিঙ্ক সিটি' আবার 'ভারতের প্যারিস' নামেও পরিচিত। শহরের প্রবেশদ্বার সাতটি। তার পরের দিন ১৫ ই মার্চ সকালে গাড়ি করে আমরা জয়পুরের দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণ করলাম। প্রথমে দেখি রাজমন্দির সিনেমা হল। তারপর একে একে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী বিড়লা মন্দির, অ্যালবার্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখি। তার থেকে একটু এসে হাওয়া মহল। ১৭৯৯ সালে মহারাজা প্রতাপ সিংহ এটি মহিলাদের জন্য তৈরী করেন। এখানে সবসময় হাওয়া খেলে। তারপর চোখে পড়ল জয় সিংহের 'যন্তর মন্তর'। এতে স্থানীয় সময় মাপা হয়। এর পাশেই আছে সিটি প্যালেস। ভেতরে আছে রুপোর ফুলদানি যার ওজন ৩৪৫ কেজি। ১৯০২ সালে এই জারে করে রাজা গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন। আর আছে চন্দ্রমহল, মুকুটমহল, মহারানীর প্রাসাদ, গোবিন্দ দাসের মন্দির। এগুলি দেখে আমরা জলমহল দেখতে গিয়ে সবশেষে কনক বৃন্দাবন গার্ডেন দেখে সেদিনের মতো হোটেলে ফিরে আসি।

পরের দিন ১৭ ই মার্চ সকালে আমরা গাড়ি করে আম্বের দুর্গ, মিউজিয়াম ও জয়গড় দুর্গ, গেইটর দেখলাম। আম্বের দুর্গের প্রধান আকর্ষণ টুকরো কাচের অলংকরনে সাজানো মহল। দুর্গের অপর আকর্ষণ যশোহর থেকে আসা শীলামাতার মন্দির। জয়গড় দুর্গে রয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত জয়বান কামান। নাগাড়গড় দুর্গে আছে রাজার রানী ও পাটরানীদের থাকার একই মাপের প্রাসাদ। গেইটারে রাজা ও রাজার সন্তানদের সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী সমাধি-সৌধগুলি অপূর্ব। এইসব দেখে বিকালে আমরা হোটেলে ফিরি। তারপরের দিন ১৮ই মার্চ দুপুর ২টো ০৪ মিনিটের আজমীর - শিয়ালদা ট্রেনে চেপে ১৯ শে মার্চ বিকাল ৪ টেয় বর্ধমানে পৌঁছেছিলাম। আমার আবার রাজস্থান যাবার ইচ্ছা রয়ে গেছে। রাজস্থান খুবই সুন্দর জায়গা। তাই, যারা এখনও যাওনি তারা একবার সেখানে ঘুরে এসো। আমার বিশ্বাস, আমার মতো তোমাদেরও রাজস্থান খুব ভালো লাগবে।

''মানুষের বিচার করা হবে, সে কি বললো তাই দিয়ে নয়, এমন কি সে কি করলো তাই দিয়েও নয়, তার বিচার হবে সে কি হয়ে উঠতে পেরেছে তাই দিয়ে।''

— শ্রীঅরবিন্দ

একটি প্রাচীন উপাসনাস্থল - পুরীর শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির

ঋতব্রত ভট্টাচার্য
শ্রেণী নবম

হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের কাছে একটি পবিত্র তীর্থকেন্দ্র হল বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী শহরে অবস্থিত শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির। 'মাদলাপঞ্জী' মতে, বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা হচ্ছেন গঙ্গোবংশের দ্বিতীয় রাজা গঙ্গেশ্বর। 'মাদলাপঞ্জী মতে কেশরী বংশের শেষ রাজা সুবর্ণকেশরীর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর চোড়গঙ্গো দক্ষিণ দেশ থেকে এসে গঙ্গোবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের দ্বিতীয় নৃপতি গঙ্গেশ্বর কোনো পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ পিপ্‌লি ও খুর্দা রোডের মাঝখানে কৌশল গঙ্গা নামে একটি খাল খনন করেন ও জগন্নাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণ শুরু করেন গঙ্গেশ্বর, সেটি সমাপ্ত হয় তাঁর প্রপৌত্র অনঙ্গভীমের আমলে। জানা যায়, মন্দিরটি নির্মান করতে তৎকালীন গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিশাল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের ১২ বছরের রাজস্ব খরচ করা হয়েছিল। মন্দিরটি তৎকালীন যুগের শিল্প শৈলীর নিদর্শন। মূলত পাথর কেটে কেটে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে এই মন্দির তৈরী।

মন্দিরটি মূলত চারভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল -

১) বিমান ঃ- বিমান হচ্ছে মন্দিরের গর্ভগৃহ।

২) জগমোহন ঃ- পঞ্চরথের আকারের মতো।

৩) নাটমন্দির ঃ- একরথ পীড় দেউল। প্রকাণ্ড হলঘর (ক্ষেত্রফল ২০.৭৪ x ২০.৭৪) বর্গমি.।

৪) ভোগমন্ডপ ঃ- হলদে রঙের বালি পাথরে নির্মিত। উপরের লালচে রং, গোলা রং ব্যবহারের জন্য।

এছাড়াও এই মন্দিরের চারপাশে 'মেঘনাদ' নামে এক বিরাট প্রাচীর দেখা যায়। বর্তমানে মূল ফটকের ভিতরে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়। প্রতিদিন বিকালে একজন বারো বছরের বালককে ধ্বজা নামাতে দেখা যায়।

কথিত আছে যে জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার যে তিন মূর্তি দেখা যায় তা নিমকাঠ দিয়েই তৈরী হয়েছিল, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়। প্রতি বারো বছর পর পর যে বছরে আষাঢ় মাস মলমাস (যে মাসে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় না) পড়ে, সেই বছরে মন্দিরের পিছনের একটি স্থানে ঐ তিন দেবতার মূর্তি সমাধি দেওয়া হয়, তৈরী হয় নতুন মূর্তি। বলা হয় এই মূর্তি তৈরী করে কোনো আশি বছরের বৃদ্ধ নিম গাছের কাঠ দিয়ে। একুশ দিন নির্জলা উপোশ করে অন্ধকার মন্দিরে মূর্তি তৈরীর পর তিনি সেখানেই মারা যান। মূর্তি তৈরী হয় এক ধরণের বিশেষ ছাপযুক্ত নিমকাঠে। মন্দিরের ফটকের ভিতরে কল্পতরু নামে একটি বিশাল গাছ দেখা যায়। সেই গাছে অনেক মানুষ তাঁদের মনষ্কামনা পূর্ণ করার জন্য সুতো বাঁধেন। মনষ্কামনা পূর্ণ হলে তা খুলে দিয়ে আসেন। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রথের সময় এই তিন দেবতার রথ বেরোয়। বলরাম দেবের রথ তালধ্বজ, দেবী সুভদ্রার রথকে দেবীদলন ও শ্রী জগন্নাথ দেবের রথকে নন্দীঘোষ বলা হয়। এই রথযাত্রাকে গুন্ডিকাযাত্রা বা ঘোষযাত্রা বলা হয়ে থাকে। এই তিন রথ 'গুন্ডিচা' মন্দিরে একসপ্তাহ থেকে আবার মূল মন্দিরে ফিরে আসে, বিগ্রহ সহ।

মন্দিরের একপাশে আছে ভোগশালা। অনেকজন ব্রাহ্মণ রোজ ভোগরান্নার কাজে যোগ দেন, সকালবেলায়। ভোগ রন্ধনের জন্য দরকারী উপকরণ (চাল, ডাল, গোলমরিচ, ঘি প্রভৃতি) শ্রী মন্দিরের নিজস্ব 'দেবত্র' সম্পত্তির অন্তর্গত জমিতে চাষ হয়। এছাড়াও গাওয়া ঘি পাওয়া যায় গোয়ালাদের কাছ থেকে। সেই ভোগ রাঁধুনি ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন ভরপেট খেয়ে, স্নান করে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ধুতি পরে রান্নার কাজে যোগ দেন। বহিরাগতরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বা তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেন না।

মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে কিছু আঙ্গুলের ছাপ দেখা যায়। বলা হয়, শ্রী চৈতন্যদেবের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলির সৃষ্টি হয়। মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য 'পান্ডা' বা 'পুরোহিত'দের উপর নির্ভর করতে হয়। মন্দিরে ক্যামেরা, মোবাইল প্রভৃতি নিয়ে, জুতো বেল্ট প্রভৃতি জিনিস পড়ে ঢোকা বারন। মন্দিরের ফটকে প্রবেশের আগে পা ধুয়ে নিতে হয়, সবশেষে বলা যায়, ভারতীয় ইতিহাস অনুযায়ী মধ্যযুগে নির্মিত এই মন্দির খুবই সুন্দর; যদিও ঐতিহাসিকরা মনে করেন না যে এর কাজগুলি উঁচু দরের।

''সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরী, ও চর্চা মানুষ কলকারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়!''

— প্রমথ চৌধুরী

আমার ভ্রমণ কাহিনী

অর্কদ্বীপ গুঁই

শ্রেণী পঞ্চম

আমি, মা ও বাবা প্রতিবারই দুর্গা পুজোর ছুটিতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাই। গতবার আমরা দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ও জয়পুর গেছিলাম। ২৫ শে সেপ্টম্বর, ২০০৯ সপ্তমী পুজোর দিন আমরা বর্ধমান থেকে আসানসোল লোকাল ট্রেনে গিয়ে পুজো স্পেশাল ট্রেনে দিল্লীর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ৬ টায় চাপলাম। নবমীর দিন বিকেল ৫ টায় ওল্ড দিল্লী স্টেশনে নেমে দেখি আমার বাবার এক নিকট আত্মীয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা বাসে করে গাজিয়াবাদে আত্মীয়দের বাড়িতে সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছালাম। ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ দশমীর দিন আমরা কালীবাড়ি ও বিড়লা মন্দির দেখে নিউ দিল্লীর এক হোটেলে উঠলাম। পরের দিন আমরা রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট, ইন্ডিয়া গেট, রাজঘাট, কুতুবমিনার ও লোটাস টেম্পল দেখে রাত্রি ৯ টায় হোটেলে ফিরলাম। কিন্তু বাস দেরি করার ফলে লাল কেল্লার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে দিল্লীর পাতাল বাজারে কিছু জিনিসপত্র কিনে হোটেলে ফিরলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর বিকেল ৪ টের সময় বাসে করে পৌঁছে গেলাম দিল্লীর লালকেল্লায়। সেখানে লালকেল্লা ঘুরে সন্ধ্যে ৬ টায় শো দেখে রাত্রি ৯ টায় হোটেলে ফিরলাম। পরদিন বাসে করে সকাল ১০ টায় আগ্রা পৌঁছে গেলাম। সেখানে প্রথমে আগ্রার লালকেল্লা এবং আকবরের সমাধি স্থল দেখে বিকেল ৫ টায় আকর্ষনীয় তাজমহল দেখলাম। তাজমহল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর আমরা

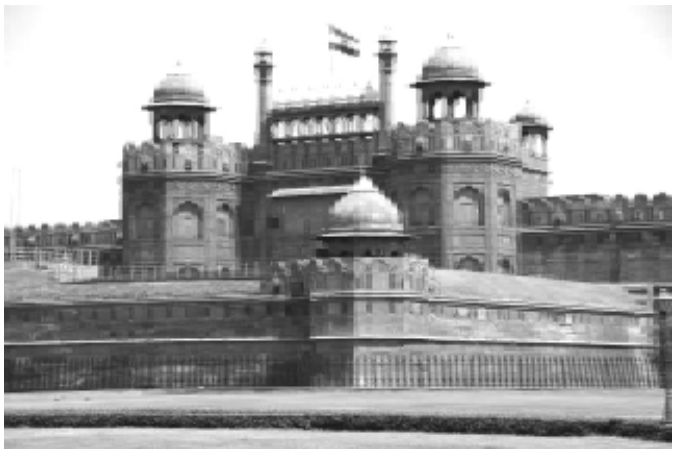

মথুরা ঘুরে রাত্রি ৯ টায় বৃন্দাবনে পৌঁছালাম। সেই রাতটা সেখানে থেকে পরদিন বৃন্দাবনের ২৫ টি মন্দির দেখে বিকেল ৫ টায় জয়পুর পৌঁছে এক হোটেলে থাকলাম। পরদিন জয়পুর ঘুরলাম এবং তার পরেরদিন আজমীরের মসজিদে আমার জুতো চুরি হয়ে যায়। কী আর করি? নতুন জুতো কিনে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে বর্ধমানে ফিরলাম। কিন্তু এখনও মনে পড়ে দিল্লীর লালকেল্লা, আগ্রার তাজমহলের ব্যথা। আজও মনে হয় প্রতি বছর সেখানে ঘুরতে যাই। পুজো এলেই বেড়াতে যাওয়ার জন্য আমার মন নেচে ওঠে। এবারেও দুর্গা পুজোয় আমি, মা - বাবা, দাদু - দিদা ও মাসির সঙ্গে সিমলা, কুলু-মানালি ও চন্ডীগড় বেড়াতে যাব।

"We want that education by which character is formed,
strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by
which one can stand on one's own feet."
– Swami Vivekananda

বেড়িয়ে এলাম কাশ্মীর

ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রেণী চতুর্থ

ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা হাতে একটু সময় পেলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আর বাঙালিদের তো এই ব্যাপারে জুড়ি মেলা ভার। গত বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে পুজোর ছুটিতে আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল কাশ্মীর। বিজয়া দশমীর রাত্রে 'হিমগিরি এক্সপ্রেস' ধরে রওনা দিলাম। কত জানা - অজানা নামের স্টেশন পেরিয়ে অবশেষে জম্মুতে এসে পৌঁছালাম। জম্মু স্টেশনের সবটাই সেনা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সঙ্গের ব্যাগপত্রের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা হবার পর বাইরে বেরনোর অনুমতি পেলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি অগণিত ভারতীয় সেনার উপস্থিতি। সাঁজোয়া গাড়িতে চেপে তারা কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। জম্মু রেল স্টেশন থেকে জম্মু শহরের দূরত্ব অন্ততপক্ষে ৫ কিমি হবে। তাই আমরা স্টেশনের বাইরে ভাড়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করলাম। পায়ে হেঁটে স্টেশন চত্বরটা একটু ঘুরে দেখলাম। বিকালের পড়ন্ত আলোয় যে দিকেই দৃষ্টি যায় সেদিকেই দেখতে পাই সেনা জওয়ানদের। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গাড়িতে চেপে পৌঁছালাম জম্মু শহরে।

জম্মু শহরটা খুব সাজানো গোছানো বলা যাবে না। শহরের প্রবেশপথে একটি নদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মান্ধাতার আমলের ব্রিজ। ব্রিজটি একমুখী হওয়ায় দু'দিকেই অসংখ্য গাড়ি অপেক্ষামান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূল রঘুনাথ বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল যথেষ্টই নোংরা ও ঘিঞ্জি। আমরা বাঙালিরা থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, তাই আমরাও বহু খোঁজাখুঁজির পর 'কৃষ্ণ কিষান' নামক এক হোটেলে এসে উঠলাম। হোটেলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান সেরে হোটেলের ছাদে গিয়ে বসলাম। পকোড়া খেতে খেতে রাতের জম্মুকে দর্শন করলাম। হনুমানজির মন্দির থেকে কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি ভেসে এল। পরদিন সকালবেলা 'পহেলগাঁও' যাওয়ার জন্য রওনা হতে হবে এই আনন্দেই ঘুমাতে গেলাম। সকালে উঠে জল খাবার খেয়ে 'পহেলগাঁও'-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দীর্ঘ পথ, পথের দু-ধারে রয়েছে ওক, পাইন, ফার, রডোড্রেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া গাছের সারি, মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। পথে যেতে যেতে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সোনালি সূর্যোদয় ও দেখছি, কখনও আবার ঝরনার শব্দ কানে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি। দীর্ঘ পথ, পথের মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ছে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ছাউনি। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় আমরা গিয়ে থামলাম 'পহেলগাঁও'-এর হোটেল 'ব্রাউন প্যালেস'- এ। সকালে দেখি ঘন কুয়াশায় মনে হচ্ছে যেন চতুর্দিক ছেয়ে আছে। হোটেলের পাশেই দেখলাম একটি ফলে ভরা আপেল গাছ। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আপেল গাছের তলায় গিয়ে পরম মমতায় আপেলগুলোতে হাত বোলাতে লাগলাম। চতুর্দিকেই ঘন সবুজ ঘাসের পুরু আস্তরণ। ভোরের শিশিরে তারা যেন স্নান সেরে নিয়েছে। একটু বেলা বাড়তেই গাড়ি ভাড়া করে বেড়াতে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম 'বেতাব ভ্যালি'। বেতাব সিনেমা শুটিংয়ের ফলে এই নামকরণ। সেখানে দেখলাম সবুজের অফুরন্ত সমারোহ। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা দেখি, সেখানে গিয়ে দেখি ভেড়ার দল। ওখান থেকে কুলু ভ্যালি গেলাম। কিছুটা পথ যেতে হয় ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়ার যাত্রা শেষ হবার পর গাড়ি চেপে আবার হোটেলে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে ওখানকার বাজার দেখতে গেলাম। চমৎকার লাগল। পরেরদিন গন্তব্য পহেলগাঁও। বাসে চেপে প্রকৃতির অপূর্ব নিদর্শন দেখাতে দেখাতে চললাম। চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের নীচে ভয়াল খাদ। দেখতে দেখতে আমরা শ্রীনগর পৌঁছে গেলাম। সেখানে 'গোল্ডেন লজ' নামক হোটেলে থাকলাম। তখন বাজে ১২ টা। তারপর খাওয়া ও বিশ্রাম। তারপর ঝিলম নদ দর্শন। পরদিন সকালে বাসে চেপে শ্রীনগরের ডাল লেক গেলাম। সেখানে হাউসবোটে চড়ার অভিজ্ঞতা হল। ওখান থেকে বিকালে বাসে চেপে প্রথমে মোগল গার্ডেন গেলাম। সেখানে দেখে মনে হচ্ছিল, ফুলের দল পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে। ওখানে সবাই ছবি তুললাম এবং বেড়িয়ে এলাম। তারপর হজরত মহম্মদ মসজিদ গেলাম। কথিত আছে যে, এই মসজিদে তাঁর একটি চুল আছে। সেখান থেকে আমরা লালচক বাজারে গেলাম। সেখানে জামাকাপড় কেনা হল। পরদিন বাসে চেপে 'কাটরা' গেলাম। এবং রাত ১০ টার সময় খেয়ে বৈষ্ণোবেদী দর্শনের জন্য রওনা হলাম। সেখানে পুজো দিয়ে আসল মূর্তির গুহা দেখে সকাল ১০ টার সময় নামলাম। ওঠার পথে খাড়া উঁচু রাস্তা। ছবি তুললাম প্রচুর। পরদিন বাসে চেপে ফিরে এলাম। জম্মু হোটেলে নামলাম। এবার বর্ধমানে ফেরার পালা।

পাহাড়ের রানি ঃ সিমলা

সৌম্যজিত রায়
শ্রেণী নবম

তখন ভোর পাঁচটা। আমরা সপরিবারে এসে পৌঁছালাম কালকা স্টেশনে। তারিখটি ছিল ২৯ শে ফেব্রুয়ারী। 'কালকা মেল' ছিল আমাদের এ যাত্রার পরিবাহক। উত্তর ভারতের শিবালিক পর্বত শ্রেণীর অন্তর্গত হিমাচল প্রদেশের এই কালকা স্টেশনটি ছিল ব্রড গেজের প্রান্তিক বিন্দু। হিমাচলের রাজধানী সিমলা যেতে গেলে এখান থেকেই টয়ট্রেনে করে রওনা দিতে হয়। সেইমতো আমরা ভোরবেলাতে স্টেশনেই জলখাবার সেরে উঠে পড়লাম টয়ট্রেনে। চলছি সিমলার পথে।

টয়ট্রেনের অগ্রগতি ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হতে থাকে এবং প্রভাত রক্তিম সূর্য দিগন্ত ছেড়ে ক্রমশ মধ্য গগনে উদিত হতে থাকে। সেই রবির স্বর্ণাভ কিরণে সিমলার অপরূপ ভাস্বর পর্বত শৃঙ্গগুলি স্বর্ণবেশে সজ্জিত হয়। আমাদের যাত্রাপথে ১০৫ টি টানেল অতিক্রম করতে হয়। টানেলে টয় ট্রেনের প্রবেশ মাত্রই ট্রেন মধ্যস্থিত পর্যটকবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে উল্লাসে মেতে উঠতে থাকে। লাইনের ধারে পর্বত শীর্ষে পাইন, ঝাউ, দেবদারুর পর্যায় সারণী পরিলক্ষিত হয়। ট্রেন যত বেশী উচ্চতায় উঠতে থাকে আকাশের মেঘ ততই নীলাম্বর হতে থাকে। দুধারের পাহাড়ি জনবসতি এবং সেই দুর্গম পরিবেশে তাদের অবস্থান দেখে আমি শিহরিত হই। তাদের সহিষ্ণুতা আমাকে প্রেরণা দেয়। এদিকে ট্রেন তার আপন ছন্দে চলতে থাকে সেই পর্বত শৃঙ্গের গা বেয়ে - কু-হ-হ, ঝিক-ঝিক-ঝিক। টয়ট্রেনের জানলা দিয়ে সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দেখে আমি যেন বিভোর হয়ে পড়ি। সেখানকার স্বর্গ ন্যায় শোভা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

হঠাৎ করে ট্রেনের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন থেকে একটি জোরালো সিটির আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হয়। বুঝতে পারি ট্রেন ক্রমশ ধীর গতি অবলম্বন করছে - বোধ হয় কোন স্টেশনের আগমন। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছাই সিমলার হিল স্টেশনে। সামনেই বিশাল পর্বতচূড়ার শীর্ষদেশে দেখা যায় সিমলার পাহাড়ি শহর - মল। 'পাহাড়ের রানি' সিমলা তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয় সকল পর্যটকের মন জয় করতে। পরক্ষণে টয়ট্রেন থেকে নেমে আমার যে অনুভূতিটি হল তা ভোলবার নয়। অনুভূতিটি অনেকটা এক অজানা স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আনন্দ, যে স্বর্গরাজ্য হল সিমলা 'দি কুইন অব হিলস্'।

''সাহিত্যের উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়,
কল্পনা শক্তির দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে।''
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজিরাঙার জঙ্গলে এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা (সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

মৈনাক মান্না

শ্রেণী দশম

মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা স্মৃতিকোঠায় স্থায়ী হয়ে থাকে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের এমনই এক ঘটনার বিবরণ আমি দিচ্ছি যা ভাবলে আজও শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হই। প্রতিবারের মত এবারেও আমরা পুজোর ছুটিতে সকলের সাথে ভ্রমণে বেড়িয়েছিলাম। আমরা গুয়াহাটী - তেজপুর - বোমডিলা হয়ে তাওয়াং পৌছে তুষারাবৃত শৈলশিরার সৌন্দর্য উপভোগ করে পুনরায় তেজপুর পৌছালাম। তারপর সেখান থেকে দুই ঘন্টার যাত্রা করে রাত্রিবেলায় আমাদের বহু আকাঙ্খিত বুকিং করা কাজিরাঙার ফরেষ্ট বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। ছোট থেকেই জঙ্গল আমাকে বারবার কাছে টানে। এবার আমার জীবনের সেই ইচ্ছাই যেন পূরণ হতে চললো। জ্যোৎস্নার রাতে ঝিঁঝিঁর ডাকে জনকোলাহলের অনের দূরে কাঁটাতারে ঘেরা সে যেন এক মায়াবী

পূর্বেই জেনেছিলাম যে সারা পৃথিবী জু

একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য, যা অন্যত্র অমিল। তাই উ

থেকেই চড়তে শুরু করে। তবে এই জঙ্গলেও যে

বিরল প্রজাতির এক ভয়ঙ্কর শিকারী প্রাণীর দেখা

পাবো তা অবশ্য কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। প

অর্থাৎ আমি, আমার দুই মাসি ও মাসতুতো দাদা এ

বসলাম ও বাংলো থেকে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের বাহন ভেজা মাটিতে থামের মত পায়ের ছাপ ফেলে দুলকি চালে চলতে লাগলো। একটা ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ আমাদের নাকে ভেসে আসছিল। বিভিন্ন নাম না গাছ ও অর্কিড দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। কিছু কিছু ডালপালা এসে আমাদের আঘাত করতে লাগল। গভীর অরণ্যের কিছু জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে খুব সামান্য সূর্যরশ্মি পড়েছে। বিভিন্ন পশু পাখির সব বিচিত্র আওয়াজ আমাদের কানে আসছিল। তারপর আমরা শাবকসহ গন্ডার, বুনো মহিষ, বাইসন ও হাতির পাল, পরিযায়ী পাখি, গাছের ডালে অজগর ও বিভিন্ন প্রজাতির হরিণকে জল খেতে ও বিচরণ করতে দেখলাম। আমাদের দেখে কিন্তু হরিণ ছাড়া অন্যরা সামান্যও সরে গেল না। তারপর একটা ময়ূরের হঠাৎ ভয়কাতর আওয়াজ শোনার পরই আমরা আমাদের নিকটেই ঘাসের উপর কোন প্রাণীর যেন তীব্র গতিতে ছোটার শব্দ শুনতে পেলাম এবং তার পরেই একটি প্রাণীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম এবং তার সাথে সেই শব্দেরও অবসান ঘটল। আমাদের মাহুত জানালো যে একটি সম্বরের জীবন শেষ হয়ে গেল। এতে আমাদের রক্তচাপ একলাফে বেশ কয়েকধাপ বেড়ে গেল। আমাদের চোখের অন্তরালে এই প্রকৃতিতে যে কত জন্ম-মৃত্যু চলছে তা আমরা বুঝতেই পারি না। এরপর সেই অরণ্য অতিক্রম করে আমরা এক তৃণভূমিতে এসে পৌছালাম। সেখানে একটি জলাশয়ের ধারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে মাহুত বলল যে এটি একেবারে টাটকা। এতে আমাদের

পেল। এরপর আমাদের হাতি দল থেকে আলাদা

ন। তারপর একটি জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো

া হঠাৎ বেড়ে এক মানুষ হয়ে গেছে। এমন সময়

ানোয়ারের আওয়াজ যেন মূহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে

তে লাগল এই অরণ্যে আমরা পাঁচজনই কেবল

সব কিছু শূন্য। সেইসময় হাতির আচরণও কেমন

তে পারলাম। সে আর কিছুতেই এগোতে চায় না। আমাদের মাহুতও দেখলাম কেমন যেন নীরব। সে আর কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না। সেই সময় কতকগুলি হরিণ যেন রূদ্ধশ্বাসে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে পেরিয়ে গেল। এমন সময় আমাদের সম্মুখে ঘাসের বন যেন কেঁপে উঠলো এবং বিদ্যুৎগতিতে যেন হলুদ রঙের কিছু একটা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। এর সাথে সাথেই দূর থেকে একটা হাতির ভীষন বৃংহতি শুনে আমাদের হাতিও পেছন ফিরে দৌড়োতে আরম্ভ করল। তখন আমরা সেই প্রাণীটিকে প্রত্যক্ষ করেই যেন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়লাম। আমরা হাতির পিঠ থেকে দেখলাম যে আমাদের পিছনে তীব্রগতিতে ছুটে আসছে ভারতের জঙ্গলের রাজা ও সবচেয়ে ধূর্ততম ও শক্তিশালী শিকারী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তার আকাশ ভেঙে পড়া

গর্জনে মেরুদন্ড দিয়ে যেন এক শীতল রক্তস্রোত বয়ে গেল। সেই প্রাণীর গতি, শারীরিক ক্ষমতা এবং প্রতিটি লাফ দেখে মনে হচ্ছিল আমরা যেন জীবনের চরমতম মূহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের হাতি ও বাঘের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ মিটার এবং আমাদের হাতিটি মাঝারি আকারের হওয়ায় তার উচ্চতাও বেশী ছিল না। এছাড়া আমাদের হাতি যেভাবে দৌড়াচ্ছিল তাতে আমাদের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়াটাও অসম্ভব কিছু ছিল না এবং তাহলে যে কী ঘটতো আশা করি সকলের কাছেই তা অনুধাবনীয়। সেই সময় পরিবার, মা, বাবা, বাড়ি, বিদ্যালয়, জীবনের সকল ঘটনা আমি যেন সবই ভুলে গেলাম ও কেবল সেই বাঘের দুটি হিংস্র চোখ দেখতে লাগলাম। এই সময় আগে দেখা সবকিছু যেন স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেল। তবে এতকিছুর মধ্যেও যে আমি স্নায়ু শক্ত করে রেখে সেই বাঘকে ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি।

তবে ঘটনার নিষ্পত্তি এখানেই নয়। এরপর আমাদের হাতিকে সেই দীর্ঘকার হলুদ কালো ডোরা কাটা শ্বাপদ প্রায় চল্লিশ মিটার তাড়া করার পর অন্য একটি বড় হাতি এসে তাকে বাধা দিতে গেলে সে তার শুঁড়ে আক্রমণ করে। কিন্তু এরপর সে বারংবার পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে থাকে। এইভাবে বার-চারেক হওয়ার পর সেই হাতির মাহুত একটি লোহার দন্ড তাকে ছুঁড়ে মারায় সে হাতিকে ছেড়ে দিয়ে সেখানেই বসে গর্জন করতে থাকে। এরপর হাতির শুঁড়েও অনবরত রক্তপাত হতে থাকে। আমিও দেখি যে হাতি ছোটার সময় বিভিন্ন ডালপালায় লেগে আমার শরীরও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এইভাবে চোখের সামনে বাঘ - হাতির লড়াই যেন একটি মূর্হূতের মত আমার চির জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। এরপর বন অধিকর্তা আমাদের কাছে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ নিয়েছিলেন। সফর শেষে আমরা বাড়ি ফিরে এসে পরের দিন সেই সংবাদ 'টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া' সংবাদপত্রে দেখে ব্যাপারটা জানতে পারি। আসলে প্রাণীটি ছিল একটি বাঘিনী। তার দুটি শাবক থাকায় সে ক্ষিপ্র ও ভীত হয়ে আমাদের আক্রমণ করে। তবে এই ঘটনা আজও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই ঘটনা মনে পড়লেই মাঝে মাঝে আমার রাতের ঘুম ভেঙে যায়। এ যেন ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে থেকেও ফাঁসি না হওয়া। মৃত্যুযন্ত্রনা যে কী জিনিস তা আমি এই ঘটনাতেই বুঝতে পেরেছিলাম।

শিল্পী ঃ মরিৎস কর্নেলিস এশার

জানার কথা

কুবের ঃ বর্ধমান যে এক প্রাচীন জনপদ এবং এখানে বহুধর্মের সহাবস্থান ঘটেছিল তার প্রমাণ হল বৌদ্ধ কুবের মূর্তিটি। এই মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয় কাঞ্চননগর অঞ্চলে। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে এটি।

(চিত্র ঃ সৌজন্যে ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা)

লাদাখের ডায়েরি

নভোনীল মজুমদার
শ্রেণী দশম

সকাল ৮ টা, দিল্লী, 2nd June, 2009, মঙ্গলবার

আজ মনে হয় ডায়েরি লেখার মতো বিশেষ কিছু নেই। দিল্লীর কিছু জায়গা যেমন রেড ফোর্ট, লোটাস টেম্পলে ঘুরলাম। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা যে, আজই আমরা রাত্রে লাদাখগামী প্লেনে চাপব। লাদাখের কথা ভেবে একটা আলাদা উত্তেজনা হচ্ছে।

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট, লে, লাদাখ, 3rd June, বুধবার

এখন সন্ধ্যা নেমেছে। তাকিয়ে আছি কাঁচের জানলার বাইরের দিকে। আজকে ভোর চারটের সময় লাদাখ এয়ার পোর্টে পৌঁছেছি। তারপর গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছালাম। চারিদিকে পাহাড়, দূরে বরফ দেখা যাচ্ছে, তারই মাঝখানে এই ছোটো উপত্যাকায় লাদাখের রাজধানী এই লে শহর। হোটেলের এই কাঁচের বাইরেই ইউক্যালিপটাস গাছের বন। মাটির ওপরে কিছু সুন্দর পাহাড়ি ফুল ফুটে আছে। পাহাড়ের মাঝখানে কিছু কিছু বৌদ্ধস্তুপ দেখা যাচ্ছে। পরদিন তিব্বতী গোমফায় যাব। এই জায়গা প্রায় ১২০০০ ফিট উঁচু। আজ আপাতত হোটেলেই থাকব।

বেলা ১২ টা ১৫ মিনিট, 4th June,বৃহস্পতিবার

আজ বেরিয়েছি গুম্‌ফার পথে। প্রথমেই নেমেছি হেমজি গুম্ফায়। গুম্ফার ভেতরে এক অনন্য পরিবেশে। বৌদ্ধরা নিজেদের মন্ত্র পড়ছে। এরপর যে গুম্ফায় গেছি তা হল থিকসে গুম্ফা। এই থিকসে গুম্ফা আবার মাটি থেকে অনেক উপরে। সিড়ি ভেঙে অনেকটা উঠতে হয়েছে। চারিদিকের পাথরে লেখা 'ওঁ মনিপদ্মে হুম্' বোধহয় তিব্বতী ভাষায় লেখা। বাংলা অর্থটা জানি না।

চিত্র ঃ ইন্টারনেট

জিংগ্রাল, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট, 5th June, শুক্রবার

আজ আমরা যাব ন্যাংগর লেক। এই লেকটি লে শহর থেকে 150 km. দূরত্বে অবস্থিত। প্যাংগং লেকের পথেই একটি স্থানের নাম জিংগ্রাল। পাহাড়ের কনকনে হাওয়া বইছে। এখানকার তাপমাত্রা 4^0 - 8^0 c.

চ্যাংলা, সকাল ১১ টা ০৫ মিনিট, 5th June, শুক্রবার

প্রচন্ড ঠান্ডা। উষ্ণতা বোধ হয় 1^0 - 2^0 c হবে। প্রায় 18000 ফিট উঁচু স্থান। এখানে চারিদিকে বরফ আর বরফ। এখানে বরফের উপরে কিছু ফটো তুলেছি। প্যাংগং লেকে যাচ্ছি বলে এক আলাদা উত্তেজনা হচ্ছে। শুনেছি এই লেকের এক-তৃতীয়াংশ আমাদের দেশে, বাকিটা চীনে।

প্যাংগং, ১২ টা ১৫ মিনিট, 5th June, শুক্রবার

অসাধারণ! কথায় প্রকাশ করা যাবে না। জলের এত রং আগে কখনও দেখিনি। কোথাও নীল তো কোথাও আবার সবুজ। বহু যাযাবর পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। পাশের পাহাড়টার রং মিনিটে মিনিটে বদলাচ্ছে।

খরডুঙ্লা [Khardungla], নুব্রা ভ্যালির পথে, 6 th June, শনিবার, ১০ টা ২৫ মিনিট

আজকে আমাদের গন্তব্যস্থল নুব্রা ভ্যালি। ডায়েরিটা লিখছি খরডুঙ্লা পাস থেকে। এটি পৃথিবীর সবথেকে উঁচু মোটোর চলাচল উপযোগী পথ। উচ্চতা 18380 ফিট। উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে।

নুব্রা ভ্যালি, 6th June, শনিবার, ১ টা ১৫ মিনিট

শীতের দেশেও মরুভূমি। দুদিকে বিস্তৃত বালি। তার মাঝখানে সরু পথ দিয়ে গাড়ি করে এসেছি আমরা। দু কুঁজওয়ালা উটের পিটে চাপলাম। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র এখানেই দু'কুঁজওয়ালা উট পাওয়া যায়।

কারগিল, 9th June,মঙ্গলবার, রাত ৯টা

লে ছাড়িয়ে কাশ্মীর পথে চলেছি। মাঝখানে এই কারগিল শহরে রাতের মতো আস্তানা গেড়েছি। কালকেই হয়ত কাশ্মীরে পৌঁছে যাব।

শ্রীনগর, কাশ্মীর, 10th June, বুধবার, রাত ৮ টা ১০ মিনিট

এখন সবে সন্ধে নামল। শ্রীনগরে খুব দেরি করে সন্ধে হয়। এখন বুঝলাম কাশ্মীরকে কেন ভূস্বর্গ বলা হয়। যেখানে হোটেল পেয়েছি সেই জায়গাটি কাশ্মীরের বিখ্যাত ডাল লেকের কাছেই। ডাল লেককে আবার ছোটো ভেনিস শহর বলা যায়। এখানকার জলের মধ্যেই বাড়ি - ঘর, দোকান - পাট উঠে আছে। কোথাও কোথাও Floating Land - ও দেখা যায়। শুনেছি চাষবাসও নাকি জলের উপর Floating Land - এই হয়।

শ্রীনগর, কাশ্মীর, 12th June, শুক্রবার, রাত ১০ টা

কালই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। মনটা দুঃখী হয়ে উঠেছে। তবে এই লাদাখকে আমি কোন দিনও ভুলব না। এইটাই আজ পর্যন্ত আমার বেড়াতে যাওয়া শ্রেষ্ঠ জায়গা। যদি পারি তো আবার একবার নিশ্চয়ই আসব। তবে শেষ করবার আগে একটা কথা বলি যে, লাদাখও Global Warming - এর শিকার। বহু জায়গা যা আগে বরফে ভর্তি ছিল তা এখন সম্পূর্ণ বরফমুক্ত। হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত এই লাদাখ মালভূমিকে বাঁচাতে সর্বপ্রথম Global Warming-কে রুখতে হবে। আর এর জন্য জনগণের সচেতনতা সর্বপ্রথম জরুরি।

হিমালয়ে কয়েকটা দিন

সিদ্ধার্থ ঘড়ুই
শ্রেণী দশম

গত বছর দুর্গাপূজার সময় ঠিক করা হল যে আমরা হরিদ্বার যাব। দল গঠন হল বাবা, মা, কাকু, ঠাকুমা, দিদা, মাসি, বড়মামা, মামী, মামার ছেলে, মাসির মেয়ে ও আমাকে নিয়ে। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরের দিন দুন এক্সপ্রেস করে হরিদ্বার যাত্রা শুরু করি। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় হরিদ্বার স্টেশনে পৌছালাম। হরিদ্বারে আমাদের কুড়ি দিনের মতো থাকার কথা ছিল। দ্বিতীয় দিন খুব ভোরে উঠে বাসে করে চারধাম (গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ) দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সর্বপ্রথম পৌঁছালাম গঙ্গোত্রী। এখানে দেবী গঙ্গার মন্দির আছে। আগে এক সময় এই স্থান থেকেই গঙ্গার উৎপত্তি ছিল; কিন্তু হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের জন্য আরও কয়েক কিলোমিটার উত্তরে গোমুখ গুহা থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। স্থানীয় গাইডের সাহায্যে গোমুখে পৌঁছালাম। কী অপূর্ব দৃশ্য! বরফের এক গুহা থেকে একটি সরু ধারা উৎপত্তি লাভ করেছে যা কোলকাতার কাছে বিশাল চওড়া রূপ ধারণ করেছে।

এইখানে গঙ্গার জল এতই ঠান্ডা যে স্পর্শ করা অসম্ভব। চারিদিকে চেয়ে দেখি কেবল বরফ আর বরফ, দেখে মনে হচ্ছে যেন এক শান্তির স্বর্গে পৌছে গেছি। গঙ্গোত্রী থেকে বাস ছাড়ল, পৌছাল যমুনেত্রী। এই হিমবাহ থেকেই যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। যমুনেত্রী থেকে গেলাম বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ হল নারায়ন তথা ভগবান বিষ্ণুর মন্দির। কথিত আছে মহাপ্রস্থানের আগে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপান্ডব এই স্থানে বদ্রী নারায়ণের পূজা করেন। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অলকনন্দা নদী-যার তীব্র শব্দ চারিদিকের নিস্তব্ধতায় ভাঙন ধরিয়েছে। এই বদ্রীনাথ থেকে কিছুটা (প্রায় ৩ কিমি) গেলেই পড়ে মানা গ্রাম। ভারতীয় সীমান্তের শেষ গ্রাম হল এই মানা গ্রাম। এখান থেকে সরস্বতী নদীর উৎস কাছেই অবস্থিত। বদ্রীনাথে তেমন বরফ ছিল না। পাশেই আছে নর ও নারায়ণ পর্বত। স্থানীয় মানুষেরা বলেন যে দুই প্রাচীন ঋষি - নর ও নারায়ণ এই স্থানে ভগবান বিষ্ণুর জন্য এই স্বর্গ নির্মান করেন। অবশেষে গেলাম কেদারনাথ। কেদারনাথ হল পাহাড়ের উঁচু স্থানে অবস্থিত একটি শিব মন্দির। এই মন্দিরটি মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে দেখতে পেলাম বরফ চারিদিকে ছেয়ে আছে। হরিদ্বারে চারধাম যাত্রা করে দশদিন পরে পৌঁছালাম। কিন্তু আমি আরেকটি জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। আমার বহু অনুরোধের পরে কাকু আমাদের দেব প্রয়াগ নিয়ে যেতে রাজি হলেন। হ্যাঁ, দেবপ্রয়াগ যেখানে গোমুখ থেকে আসা ভাগীরথী এবং অলকানন্দা মিলিত হয়ে সেই মিলিত প্রবাহ গঙ্গা নাম নিয়ে হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে পড়েছে। এই দেবপ্রয়াগের পাহাড়ের ঢালে একটি ছোটো জঙ্গল ছিল যার মধ্যে দিয়ে একটি সরু ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে আমরা দুজন হারিয়ে যাই। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে ফিরে আসি। এরপর একদিনের বিশ্রাম তারপর গেলাম ঋষিকেশ। এখানে বহু সন্ন্যাসীর আশ্রম, মন্দির ছিল প্রধান আকর্ষণ। আরেক দিন মুসৌরী শহর গিয়েছিলাম। যেটি ছিল একটি পাহাড়ি শহর। দেরাদুন থেকে মুসৌরী ওঠার পথে অসংখ্য দেবদারু গাছের শোভা যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করে। এই পথেই ছিল একটি শিব মন্দির। এই মন্দিরটির নিয়ম অত্যন্ত কড়া। এখানে বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে পয়সা ছোঁড়া বারণ, প্রসাদ হল খিচুড়ি ও এক পেয়ালা চা।

ফেরার আগের দিন গেলাম হরিদ্বার শহর সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত মনসা মন্দিরে, যেখান থেকে নীচের গঙ্গার জলাধার এবং হরিদ্বার শহরটিকে অত্যন্ত সুন্দর লাগছিল এবং গেলাম গঙ্গার অন্য দিকের চন্ডী পাহাড়ে। হরিদ্বারে আমার শেষ রাত্রি চলে এল। এর মধ্যেই সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা আরতি দেখে এসেছি। পরের দিন সকালবেলায় আমাদের ট্রেন ছিল। সেদিন খুব ভোরে উঠে বাবার সাথে গেলাম বিষ্ণুঘাট, হর কী পৌড়ী। দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে যে সব জায়গা দেখলাম তা ধীরে ধীরে যেন চোখের সামনে ফুটে উঠল। তারপর সাক্ষী রইল শান্ত ও স্তব্ধ ভোরের হরিদ্বার শহর। অবশেষে এল সেই বিষণ্ণ মুহূর্ত যখন আমাকে হরিদ্বার ছেড়ে চলে আসতে হল। দুদিন পরে বর্ধমান শহর পৌঁছালাম। চেনা শহরটাকে পেয়ে আবার আনন্দিত হলাম। আজও মনে হাতছানি দিয়ে যায় হিমালয়ের ঐ খন্ডটির প্রাকৃতিক শোভা যার বিবরণ হয়তো বা কোনো মানচিত্রে বা ইন্টারনেটে নেই। কখনো কখনো মনে ইচ্ছা জাগে সবকিছু ছেড়ে চলে যাই হিমালয়ের সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করতে, যা হয়তো খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবান মানুষেরই কপালে আছে।

চিত্র ঃ ইন্টারনেট

আমার ''ভাইজাগ'' ও ''হায়দ্রাবাদ'' ভ্রমণের স্মৃতিকথা

দীপ্তেন্দু পাল
শ্রেণী সপ্তম

২০১১ সাল। ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখ আমাদের ভাইজাগ যাওয়ার কথা। ২০ তারিখ আসার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আমরা ব্যাগ গুছিয়ে বর্ধমান স্টেশনের পথে রওনা দিলাম। স্টেশনে লোকাল ট্রেনে চেপে হাওড়া পৌঁছে সেখানে ভাইজাগ যাওয়ার ট্রেনে চাপলাম। আমি ছোটোবেলায় একবার ভাইজাগ ও হায়দ্রাবাদ গেছি। ট্রেনে চেপে তার পরদিন ১০-১১ টায় আমরা ভাইজাগ পৌঁছালাম। স্টেশন থেকে হোটেলে গিয়ে আমরা স্নান খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলাম। বিকেল বেলায় বেরিয়ে পড়লাম বেলাভূমি দেখার জন্য।

চিত্র ঃ ইন্টারনেট

বেলাভূমিতে পৌঁছে আমরা দেখলাম বেলাভূমির কাছাকাছি সামুদ্রিক অঞ্চলের উঁচু পাথর, যার উপর ঢেউ আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়লে যে সৌন্দর্য উৎপন্ন হয় তা কোনদিনও ভোলার নয়। বেলাভূমির পিছনে অ্যাকোরিয়াম ভর্তি একটা বড়ো ঘরের মতো ছিল যেখানে নানান রকমের মাছ। যেমন ক্যাটফিস, গোল্ডফিস ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল নানান ধরনের কচ্ছপ, যেমন - লংনেক্ টার্টেল ও রেড ইয়ার টার্টেল। এরপর দিন আমরা গেলাম একটি ছোটো মিউজিয়াম দেখতে। তারপর আমরা গেলাম ডুবোজাহাজ বা সাব্‌মেরিন দেখতে। সাবমেরিনটির নাম 'কুরসুরা'। এটি এখন অবসর প্রাপ্ত। তাই এটি দেখার জন্য রাখা আছে। এটিতে যে দুটি অস্ত্র আমি দেখেছিলাম সেগুলি হল সি-মাইন ও টর্‌পেডো। এরপর আমরা গেলাম জাহাজ বন্দরে। কিন্তু সেখানে সরাসরি শুঁটকি মাছের দুর্গন্ধে আমাদের বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল।

ঐ দিন বিকেলবেলা 'অনন্যা এক্সপ্রেস'-এ চেপে আমরা তার পরেরদিন সকালবেলা হায়দ্রাবাদে এসে পৌঁছলাম। আগের বার যখন হায়দ্রাবাদে গিয়েছিলাম তখনকার একটা জায়গা আমার খুব ভালোভাবে মনে পড়ে, সেটি হল RAMOJI FILM CITY। পরেরদিন আমরা সকাল সকাল রওনা হলাম RAMOJI FILM CITY -র উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম এটি পৃথিবীর বৃহত্তম FILM CITY -তে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম RAMOJI RAO।

সেখানে বাসে চেপে মূল জায়গায় গেলাম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করলাম। এছাড়া সেখানে ছিল বিভিন্ন রাইড্, স্টুডিও কমপ্লেক্স। এছাড়া সেখানে আমরা দেখলাম কীভাবে সিনেমাতে ডাবিং করা হয়। পিছনের সবুজ পর্দাতে নানা রকমের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। এছাড়া আমরা সেখানের অনেকগুলি হোটেলের একটিতে খাবার খেলাম। তারপর আবার বাসে করে গোটা RAMOJI FILM CITY ঘুরলাম ও জানলাম কোথায় কী সিরিয়াল ও সিনেমার শুটিং হচ্ছে বা হয়েছিল। এইসব কিছুর মধ্যে আমার পছন্দ হয়েছিল মুঘল গার্ডেন ও রামোজি স্পিরিট শো এবং ডোম থিয়েটার। সবকিছু দেখার পর সন্ধ্যাবেলা বাসে করে আমরা আবার হোটেলে ফিরলাম। এর পরের দিন আমরা গেলাম চারমিনার, তারপর গেলাম 'জু-লজিক্যাল পার্ক' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন সোমবার থাকায় পার্ক বন্ধ ছিল। এরপর গেলাম গোলকুন্ডা ফোর্টে। যেখানে আমি আমার জীবনে প্রথমবার কোনো সিনেমার ফাইট সীনগুলির শ্যুটিং দেখলাম। সেইদিন আবার হোটেলে ফিরে 'অনন্যা এক্সপ্রেসে' চেপে হাওড়া ও হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে বর্ধমানে ফিরলাম।

প্রবন্ধ

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা

শুভ্রনীল রায়
শ্রেণী দশম

বর্ধমান জেলার গলসী থানার অধীনে এই ছোট্ট গ্রাম চান্না, ছায়ায় ঢাকা শান্তির নীড়। গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে ছোট নদী খড়ি, কুলকুল শব্দে কী যেন বলে চলেছে। রাতের পাহারাদার যেমন গ্রামের অধিবাসীদের হাঁক পেড়ে জানায় 'জাগো সতর্ক হও' আমার মনে হয় ওই ছোট্ট নদী তেমনি বলছে, 'ওগো চান্নার গ্রামবাসী, তোমরা গ্রামকে চেন, জানো ও ধারক - বাহক হও গ্রামের গৌরবের।' গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সাধক কমলাকান্তের মাতুলালয় জেলা সংস্কৃতি পরিষদের স্মৃতি ফলকে চিহ্নিত। গ্রামের উত্তর প্রান্তে মা বিশালাক্ষীর মন্দির, সাধকের সিদ্ধাসন এবং বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূণ্য জন্মভূমির তৃণগুল্মে ভরা পবিত্র মাটি। এই বিপ্লবীর দেপাড়া বাটীতে অগ্নিযুগের অনেক অগ্নিপুরুষ এমনকি স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথও আত্মগোপন করেছিলেন কিছুদিন। ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে রাত্রির গহন অন্ধকারে যতীন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তিনি। বিপ্লবী আন্দোলনের সেই 'ব্রহ্মা'র অনেক ইতিহাস আজ একান্ত অবহেলায় বিস্মৃত ও উপেক্ষিত।

হেমন্তের এক ঊষালগ্নে, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর যতীন্দ্রনাথ কালিদাস বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালার পড়াশুনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য যতীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বর্ধমানে আসেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি রাজ কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছিলেন। হেমতপুর মহাবিদ্যালয়ের অঙ্গনেও তিনি কিছুকাল বিচরণ করেন।

বর্ধমানে পড়াশুনা করার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সৈনিক হয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করবেন বলে মনস্থির করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যুবক যতীন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করেন। তিনি যতীন্দর উপাধ্যায় ছদ্মনাম নিয়ে বারোদা রাজ্যের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। একদিন তিনি বরোদার গাইকোড়ের মহারাজকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন কিন্তু নিজে গুরুতরভাবে জখম হন। যুবক যতীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার জন্য রাজা নিজের ব্যক্তিগত সচিব শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে ভার দেন। এই সূত্রে অরবিন্দ ঘোষের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। যতীন্দ্রনাথ শ্রী অরবিন্দকে বিপ্লবের মধ্যে আসার জন্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন এবং প্রমথনাথ মিত্রের আনুকূল্য লাভ করেন। এবং 'অনুশীলন সমিতিতে' যোগ দেন। এরপর পি.মিত্র সাহেব বরোদা থেকে আসা যুবকদের সঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি' - র যুবকদের মিলন ঘটিয়ে দেন। এই মিলিত যুবকদের নিয়ে 'ইষ্ট ক্লাব' নামে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই বিপ্লবী নীড়ের সকল সদস্যদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নানা কারণে ঐ দলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এরপর তিনি দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহন করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবে বিপ্লবী প্রচারে যান। তাঁর সংস্পর্শে আসেন সর্দার অজিত সিং, কিষাণ সিং, আম্বালার ডঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোস্বামীর স্বীকারোক্তিতে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাসের ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য এই মামলায় বিপ্লবীদের জয় হয় এবং তিনি মুক্তি পান। এরপর তিনি দেশ ভ্রমণে বের হয়ে সোহ-হং স্বামীর কাছে সন্ন্যাস মতে দীক্ষা নিয়ে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। এরপর তিনি চান্নায় আশ্রম স্থাপন করে সেখানে বসবাস শুরু করলেও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বাঘাযতীন তাঁর বিপ্লবী গুরু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আসেন। এই আশ্রমে ভগৎ সিং, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস সহ বহু নামকরা বিপ্লবীরা এসেছেন। যতীন্দ্রনাথ গড়গড়ায় তামাক সেবন করতেন। এই গড়গড়ার নলটি একদিন খুলে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে। ক্ষত ক্রমে ক্যানসারে পরিণত হয় এবং ১৯ শে ভাদ্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে) বরানগরে বিজয় বসাকের বাড়িতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

চিত্র ঃ ইন্টারনেট

''চরিত্রের সম্পদ যাঁহার আছে তাহার অন্য সম্পদ আপনি আসে।''

— শিবনাথ শাস্ত্রী

শতোত্তর রজত-জয়ন্তী সংগ্রহশালা ও কয়েকটি প্রত্নবস্তু

সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী (শিক্ষক)

(ক)

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল তার জন্মলগ্ন থেকেই নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। এই বিদ্যালয়ের জন্মের ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বর্ধমানের মহারাজ মহতাব চন্দের নাম। ১৮৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবান চন্দ্র বসু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান টি.ই. ককস্‌হেড ও ডব্লিউ. আর. লারমিনির হাত ধরে। এরপর থেকে দ্বাদশটি দশকের অধিক সময় জুড়ে শিক্ষক ও প্রতিভাবান ছাত্রদের পরম্পরায় গড়ে উঠেছে এক গৌরবের ইতিহাস। জেলা তথা রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে এক বিশিষ্ট নাম হয়ে উঠেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২০০৮ সালে বিদ্যালয়ের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের অংশ হিসাবে এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহন করা হল। বিদ্যালয়ের অতীত গৌরব সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছাত্রদের সচেতন করে তোলবার জন্য একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হবে। এখানেও বিদ্যালয় তার স্বকীয়তা প্রমান করল আরও একবার।

মূল ভাবনা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্ত্তীর। প্রোৎসাহ ও সমর্থন দিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমিতজ্যোতি সামন্ত মহাশয়। স্থান নির্দিষ্ট হল শতবার্ষিকী ভবনের দোতলায় পশ্চিমকোণের বড় ঘরটি। শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্ত্তী ও উৎসব উৎযাপন কমিটির সম্পাদক শিক্ষক স্বপন বিশ্বাসের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হল প্রাক্তন ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ী শ্রী প্রমথনাথ অধিকারী ও শ্রী অমৃতেন্দু অধিকারীর বদান্যতায়।

এবার মিউজিয়াম গড়ে তোলার পর্ব। সংগ্রহশালার প্রদর্শ বস্তুগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হল। একদিকে থাকল বর্ধমানের রাজবাড়ি সংক্রান্ত কিছু আলোকচিত্র। সংগ্রহ হল বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের কিছু প্রাপ্তব্য আলোকচিত্র ও তৎকালীন বর্ধমানের কিছু স্মারক। আলোকচিত্রের সংগ্রহের মধ্যে থাকল প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, প্রয়াত শিক্ষক, কৃতি ছাত্রদের ছবি। মিউজিয়ামের চরিত্র দেবার জন্য বেশ কিছু প্রতিকৃতি আঁকানো হল। শিল্পী অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য প্রয়াস দিলেন এক্ষেত্রে।

এছাড়াও কর্মশিক্ষার কাজে একদা ব্যবহৃত কিন্তু বর্তমানে বাতিল হয়ে যাওয়া যন্ত্র, ঘড়ি, টাইপ রাইটার, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সেকালের বেঞ্চ, ম্যাগাজিন, খেলাধূলায় সাফল্যের ছবি ও কাপ নিয়ে গড়ে উঠেছে অতি আকর্ষণীয় সম্ভার।

মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছে ছাত্র ও শিক্ষকদের দানে গড়ে ওঠা নানা ধরনের মুদ্রা ও প্রাচীন পুথির সংগ্রহ।

৪ঠা জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে শতোত্তর রজত-জয়ন্তী সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যের তালিকায় এক উজ্জ্বল সংযোজন হল এই সংগ্রহশালা।

(খ)

এই সংগ্রহশালায় উদ্দেশ্য যেমন বিদ্যালয়ের অতীতকে সংরক্ষণ করা, তেমনি শহরের ইতিহাস সম্পর্কেও একটা বোধ গড়ে তোলা। তাই নানা স্থান থেকে নানা সূত্রে সংগৃহীত কিছু প্রত্নবস্তুকেও সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে দুটি প্রত্নবস্তুর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এই অংশের অবতারণা।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে বর্তমান বর্ধমান শহর গড়ে উঠেছে দামোদর - বাঁকা - বল্লুকা - বেহুলা - সাপজোলা নদীর অববাহিকায়। এই শহরের আদি বসতি গড়ে উঠেছিল কাঞ্চননগর থেকে শুরু করে অন্তত কানাই নাটশাল পর্যন্ত বাঁকা-দামোদরের দোয়াব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

আদি বর্ধমানের সঙ্গে ২৪ তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের নাম জড়ানো যায় কিনা নিশ্চিত ভাবে বলা না গেলেও বাংলার ইতিহাসের আদি-মধ্য যুগের পূর্ব থেকেই কাঞ্চননগর, লাকুর্ডি, গড়তালিত অঞ্চলে যে সমৃদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার প্রমান পুরী-কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা, ও বেশ কিছু মূল্যবান পাথরের মূর্তি।

ব্রাহ্মণ্য ধারার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল বিশেষভাবে। এই দাবীর সপক্ষে প্রমান হল বৌদ্ধ কুবের, বেচার হাটের ধ্যানীবুদ্ধ, বীরহাটার বুদ্ধের সারি, লাকুর্ডির নীল সরস্বতী ও মঞ্জুশ্রী মূর্তি। এগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।

কোন বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল বর্ধমান শহরে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের আদিপর্বে একটু চোখ রাখা প্রয়োজন।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৭ বা ৫৮৭ থেকে ৪৮৭ বা ৪৮৩ অব্দ পর্যন্ত

বিস্তৃত জীবৎকালে বুদ্ধদেব কোন লৌকিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে যাননি। কিন্তু তাঁর অতিলৌকিক ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেকে অনুগামী হয়েছিলেন। সকলের এই লোকোত্তর প্রতিভা থাকে না, তাই বুদ্ধদেব কিছু অনাগত ভয়ের আশঙ্কা করে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। ভিক্ষুদের শৈথিল্য, অনৈক্য ও অন্যান্য দুর্বলতা তাঁর শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গিরিব্রজের বা বর্তমান রাজগীরের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অধিবেশন হয়। উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ বচনগুলিকে গ্রথিত করা। দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হয় শতাধিক বৎসর পরে বৈশালীর বালুকারামে। বৈশালীর সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্কলহ প্রকট হয়ে ওঠে। বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের (বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্থ) উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তাঁদের তিরস্কার করা হয়। তাঁরা অপমানিত হয়ে সম্ভবত বৈশালীর মহাবনের কূটাগারশালায় এক সমান্তরাল সভা করেন। এই সভাই মহাসঙ্গীতি নামে খ্যাত হয় এবং এই প্রতিবাদী গোষ্ঠী মহাসাঙ্ঘিক নামে পরিচিত হল। মহাসাঙ্ঘিকদের মতবাদ হল অচরিয়বাদ বা আচার্যবাদ। প্রাচীনপন্থীরা পরিচিত হলেন থেরবাদী বা স্থবিরবাদী নামে। কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে থেরবাদ ও অচরিয়বাদ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং মতান্তরের ইতিহাসও আবর্তিত হয়ে চলে। প্রায় আঠারোটি মতবাদের উদ্ভব হয়ে গেল তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় পর্যন্ত।

এই তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নগরে। নানা মতভেদ দূর করে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা হয় এই সঙ্গীতিতে। সম্রাট কনিষ্কের আমলে চতুর্থ ও শেষ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করা হয় ঐ অষ্টাদশ মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পরের দুই তিন শতাব্দীতে নানা ভারতীয় ও অভারতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণে মহাযান মতবাদের ভিত্তি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মতবাদ লিখিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল নাগার্জুন রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' গ্রন্থে। হীনযান ও মহাযান দুই পথের পথিক হল চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির পরেই।

হীনযান মতে ব্যক্তি হিসাবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অর্হত্বলাভ বা বুদ্ধত্বলাভই ছিল লক্ষ্য। মহাযানীরা ব্যক্তিগত বুদ্ধত্ব লাভের অপেক্ষা বুদ্ধত্বলাভের পূর্ববর্তী পর্যায়ে, যেমন বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধ জন্মজন্মান্তরে মানব কল্যানে নিয়োজিত ছিলেন সেই অবস্থাকে মহত্তর বলে মনে করলেন। করুণা মৈত্রী প্রভৃতি 'পারমিতা' বা গুণ বিশেষের চর্চা হল লক্ষ্য। এরমধ্যে মৈত্রী হল শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই মহাযানপন্থীদের কাছে মৈত্রীর দেবতারূপ 'মৈত্রেয়' নামক এক ভাবীবুদ্ধ 'পূজা' পেতে লাগলেন।

স্কুলপাঠ্য পুস্তকে লেখা হয় বৌদ্ধদের কোন দেবদেবী ছিল না। প্রকৃত পক্ষে এই অভিমত হীনযান মত সম্পর্কে প্রযোজ্য। হীনযানের একটি বড় অনুগামী হল শ্রীলঙ্কা বা সিংহল। কিন্তু 'বেসালিকা বজ্জিপুত্তরা' যেমন প্রথম থেকেই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন তেমনি বেসালি বজ্জির পূর্বভাগের বাংলা তথা বৃহত্তর উত্তর পূর্ব ভারত মহাযানীদের প্রভাবে প্রবাবিত হল। তাঁরা নিজেদের মত করে বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয় এবং ধ্যানীবুদ্ধর রূপ অমিতাভর সঙ্গে তাঁর শক্তি পান্ডরা তথা তারার মিশ্রন ঘটিয়ে অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা করে ফেললেন।

মহাযান খুব উদার মত। তাই তিব্বত বা ভোটচীনের দানব, যক্ষ, রাক্ষস, সমতলের প্রাগার্য দেবদেবী, পৌরাণিক দেবদেবী, ডাকিনী, যোগিনী সবাই ঠাঁই পেয়ে গেলেন মহাযানী দেবলোকে। পূজার জন্য কাঠ, ধাতু, ও পাথরের অজস্র মূর্তি তৈরি হতে লাগল। এমন মূর্তি তৈরির একটি বড় কেন্দ্র ছিল নালন্দা বিহার। আজ পর্যন্ত সারা বাংলার নানা স্থান থেকে অজস্র বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বহুমূর্তি এখনও আবিষ্কারের আশায় দিন গুনছে। তবে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী রক্তাক্ত শতাব্দীগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বৌদ্ধদের একটি বড় অংশ মুসলমান ধর্মগ্রহন করেন এবং বাকিরা ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মে ফিরে যান। তাঁদের পূজিত বহু মূর্তি ভাঙা পড়ে বা পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয়। বাকি অংশ নতুন নামে হিন্দু দেবদেবীর আকারে পূজা পেতে থাকেন। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা কোন কালেই মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা বা আর্যাবর্তের মানুষদের মত ধর্মের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন না। তাই অন্তত অঙ্গ, বঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম দেশে নানা ধর্মমতের সংশ্লেষে ভাঁটা পড়ে নি। একারণেই এখানে সূর্য-বিষ্ণু, হর-বিষ্ণু বা কালীকৃষ্ণের মত মিশ্রদেবতার কল্পনা করা হয়। পৌরাণিক জনপ্রিয় দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে মিলে গেলেন বৌদ্ধধারার প্রাণের ঠাকুর অবলোকিতেশ্বর, রূপ নিলেন বিষ্ণু-লোকেশ্বর মূর্তির। এই মূর্তির নমুনা সংগৃহীত আছে আশুতোষ মিউজিয়ামে ও কলকাতা যাদুঘরে।

বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত ভগ্নমূর্তিটি নিসন্দেহে বিষ্ণু -

লোকেশ্বরের। এর একদিকে পাঁচটি হাতের আভাস স্পষ্ট এবং বৌদ্ধ লাঞ্ছন চিনতেও অসুবিধা হয় না। পার্শ্বমূর্তি হিসাবে আছেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ও একটি স্থূলকায় যক্ষ। বিষ্ণুর লাঞ্ছন হল লম্বিত বনমালা ও কৌস্তভ চিহ্ন। ২০০১ সালে গোলাহাটে শিক্ষক জয়দেব কুন্ডুর বাড়ির ভিতে এই মূর্তি কিছু মৃৎপাত্র সমেত আবিষ্কৃত হয়। এই মূর্তি গোলাহাট - ভাতছালা অঞ্চলে পাল-সেন যুগে এক সমৃদ্ধ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমান। এর ক্ষতিগ্রস্ত দশাও বর্ধমান তথা বাংলার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয়।

অপর দুটি মূল্যবান সংগ্রহ হল কালো পাথরের ব্লক। একটি হল স্তম্ভের শীর্ষদেশ। এর পদ্মদল চিহ্নে উড়িষ্যার শৈলী স্পষ্ট। অনুরূপ স্তম্ভশীর্ষ দেখা যায় নূতন হাট, মঙ্গলকোটের ইসলামী স্থাপত্যে। ভাতছালা অঞ্চলে অবস্থিত কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন অংশ আলোচ্য ব্লকটি। এটি দান করেছেন পুরোহিত শ্রী নেপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। অপর ব্লকটি পদ্মদল যুক্ত এবং কোন বিশাল স্তম্ভের পাদপীঠ। এই ব্লকটি দান করেছেন ভাতছালার দে পরিবার। সংগ্রহশালার এই তিনটি নমুনা এবং গোলাহাট নিদর্শন বর্ধমানে একাদশ - দ্বাদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ জনপদ ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। তাই এরা অমূল্য। এগুলি ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাস বোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলেই মনে হয়। এই বোধ বর্ধমানের ইতিহাস চর্চার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সংগ্রহশালার একটি মূল্যবান সংযোজন হল আঝাপুরের- সাতদেউলিয়া অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কিছু মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ। বর্ধমান অঞ্চলে খৃষ্টিয় নবম দশম শতাব্দী পর্যন্ত জৈনধর্মের একটি প্রভাব ছিল এবং আঝাপুর -সাতদেউলিয়া ছিল জৈন ধর্মাবলম্বীদের একটি উপনিবেশস্থল। আঝাপুর-সাতদেউলিয়ার বিখ্যাত শিখর দেউল, প্রস্তর মূর্তি বহু আলোচিত বিষয়। এই অঞ্চলে মৃত্তিকা খননের সময় বহু প্রত্নবস্তু উঠে আসে। সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই মৃৎপাত্রের ভগ্নঅংশগুলি সে যুগের নিদর্শন। এই মৃৎপাত্রগুলি বাবুরবাগ বাহির সর্বমঙ্গলাবাসী তৌসিফ মিদ্যার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গত বৎসরের শেষ দিকে স্টেট আর্কিওলজিক্যাল ডাইরেকটরেটের ডেপুটি ডাইরেকটর ডঃ অমল রায় এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এর উন্নতিকল্পে যাবতীয় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার আশ্বাস দান করেন। তাঁর এই স্বীকৃতি অবশ্যই আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

বিদ্যালয় সংগ্রহশালার দুটি অমূল্য রত্ন হল রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত দুটি আর্শীবাদবাণী। এই বাণী দুটি লিখিত হয়েছিল শ্রীযুক্ত নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। এই বিদ্যালয়ের প্রবীন কৃতি সন্তান ডাঃ সাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতৃদেবের স্মৃতিতে এই চিরকুট দুটি দান করে বিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। কোন ধন্যবাদই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের এই শতোত্তর - রজতজয়ন্তী সংগ্রহশালা ছাত্রদের মধ্যে স্কুল সম্পর্কে যে গর্ববোধ গড়ে তুলছে তাই নয়, শহর তথা জেলার ইতিহাস সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কেও একটা বোধ গড়ে তোলার পক্ষে সক্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠছে, এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে বহু প্রাচীন প্রাক্তন ছাত্র আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং অকাতরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে যান। তাঁদের এই আবেগ প্রত্যক্ষ করলে মনে হয় যে সামান্য পরিশ্রম আমরা করতে পেরেছি তা শতগুণ পুরস্কার হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১। দাশগুপ্ত শ্রী নলিনীনাথ, বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা।

২। দাশগুপ্ত কল্যান কুমার, প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী, কলিকাতা।

৩। গঙ্গোপাধ্যায় কল্যান কুমার, বাংলার ভাস্কর্য, কলিকাতা।

৪। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা।

৫। Bhattakali. N.K. Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca

৭। Banerjee R.D. Eastern India School of Mediaeval Sculptures, Delhi.

৮। শতবর্ষ স্মরণিকা ১৮৮৩ - ১৯৮৩, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল।

৯। শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, বিষয় ঃ বৌদ্ধধর্ম। কলিকাতা।

“To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flowr,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.”
– William Blake

এন.সি.সি. ও স্কাউট

চিন্ময় কুমার বিশ্বাস (স্কাউট মাস্টার)

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল শিক্ষাজগতের এক অগ্রণী ও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সে তার আপন ছন্দে স্বমহিমায় আলোকোজ্জ্বল দ্যুতিতে উদ্ভাসিত-প্রতিভাত। শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, শিক্ষানুসারী অপরাপর শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতেও তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে - 'এন.সি.সি.' ও 'স্কাউট' সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

এন.সি.সি.

১৯৪৮ সালে স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক বিনোদীমাধব সামন্ত ও জগজ্জ্যোতি মিত্র মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এন.সি.সি.-র স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুভসূচনা হয়, যা এক কালজয়ী ও স্মরণীয় পদক্ষেপ। অতঃপর ১৯৫২ সালে 4 Bengal Battalion NCC সাগ্রহে আমাদের স্কুলের N.C.C. Troop কে (Troop No. 89) বিশেষ স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের Battalion -এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারপর থেকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীর ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৬৬ সালে নিমাইলাল তরফদার ও ১৯৬৭ সালে সুশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং ১৯৯৪ সালে পলাশ বক্সি ও তারকনাথ রায় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে (RDC) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বর্তমানে আমাদের NCC Troop টি বহুমুখী সৃজনশীল ও সমাজ সচেতনতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে লিপ্ত থেকে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ছাত্ররা Weekly Parade ও CATC Camp গুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। আমরা বনসৃজন, পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ, পোলিও নির্মূলকরণ, শিক্ষক দিবস (৫ই সেপ্টেম্বর), পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ দিবস (৫ই জুন), হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস (৬ই ও ৯ই আগষ্ট), Red Ribbon Express Rally (20.7.2012), International Literacy Day Rally (8th Sept.), Anti Drug Rally, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সমাজসেবী স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ শতবর্ষের পদযাত্রাতে অংশগ্রহণ করেছি। ২০১১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলের নবনির্মিত বিশ্বমানের সুদৃশ্য বাস্কেটবল খেলার মাঠটির শুভ উদ্বোধন করেন। NCC ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে মন্ত্রী মহাশয়কে পুষ্পস্তবক সহ উত্তরীয় ও একটি স্মারক যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদান করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২রা আগষ্ট কমনওয়েলথ গেমস্ এর 'Queen's Baton' 70-টি দেশ পরিক্রমা করে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়। আমাদের সমর শিক্ষার্থীবাহিনীর প্রতিটি সদস্য অতি উৎসাহে সেই Rally-তে অংশগ্রহণ করে। কার্জনগেটের (বিজয় তোরণ) নিকট 15 কোটি টাকা মূল্যের "Queen's Batton' টি হাতে ধরার মুহুর্তটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আজ পর্যন্ত ২৩ জন ছাত্র পানাগড়, আসানসোল, বাঁশবেড়িয়া, ব্যাণ্ডেলে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত 'CATC Camp'-এ অংশগ্রহণ করেছে। তারপর প্রত্যেকে 'A' Certificate পরীক্ষা দিয়েছে ও কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। বর্তমানে ১০০ জন সমর শিক্ষার্থীকে 'TAWA (Tiffin Allowance & Washing Allowance) Money সংগ্রহের জন্য 'Vijoya Bank' (Nationalised Bank) -এ 'Zero Balance'- এ Account করে দেওয়া হয়েছে। এ বছর 4 Bengal BN NCC -র Commanding Officer কর্ণেল খান মামুদ এবং Sub-Major বীরেন্দর কুমার আমাদের NCC Office টি পরিদর্শনে এসে নিজেরা অভিভূত হয়েছেন ও আমাদেরকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আমরাও ওনাদের মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে দারুন উপকৃত ও ধন্য হয়েছি।

আমি বর্তমানে NCC-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। ANO (Associate NCC Officer) -র জন্য কলকাতার NCC-র Club

House-এ Interview দিয়েছি ও ANO Training -র জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আগামী সেপ্টেম্বর (২০১৩) মহারাষ্ট্রের নাগপুরের নিকটস্থ কামটিতে আমার ৩ মাসের ট্রেনিং শুরু হবে। সর্বোপরি, আমাদের বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষক ড. শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং সহ প্রধান শিক্ষক শ্রী অরুণাভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও উৎসাহদান আমাদের ভবিষ্যৎ-এ চলার পথের পাথেয় ও দিশা হিসাবে কাজ করবে।

স্কাউট

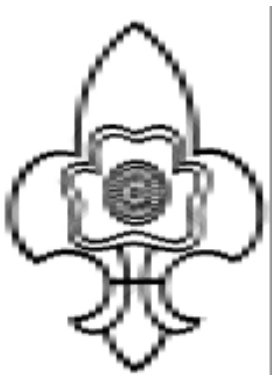

'স্কাউট' (Scout) কথার অর্থ হল - 'গুপ্তচর' বা 'সন্ধানী ব্যক্তি' বা 'সামরিক অভিপ্রায়ে গোপনে পর্যবেক্ষণ করা' (a Person sent out to bring in tidings and observe the enemy)। স্কাউটিং একটি - অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, স্বেচ্ছাসেবামূলক শতাব্দী প্রাচীন আন্তর্জাতিক যুবশিক্ষামূলক সর্বজন বন্দিত সংগঠন, যার উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের যুব সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। স্কাউট শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা যেসব জ্ঞান অর্জন করবে সেগুলি হল - প্রাথমিক চিকিৎসা জানা, মানচিত্র তৈরি ও পড়তে (Map Interpretation) জানা, ব্রীজ তৈরী, গ্রহ নক্ষত্র চেনা, দূরত্ব, অসুস্থ ব্যক্তি বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার ও সেবা, দড়ির বাঁধন, অজানা পথ চলা (trekking), তাঁবু (tent) তৈরী, যোগাসন, ও বি.পি পি.টি-র দ্বারা শরীর গঠন করা, রন্ধন প্রণালী (Cooking) জানা ইত্যাদি। স্কাউট প্রশিক্ষণ মূলত খেলাচ্ছলে আনন্দদায়ক শিক্ষা (Playway in Education), যেখানে ছাত্ররা একই সঙ্গে খেলবে, নাচবে, গাইবে, হাসবে - সর্বোপরি ভবিষ্যতে সুস্থ সবল সৎচরিত্রের সুনাগরিকের মর্যদালাভ করবে। জীবনের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ, যা বিদ্যালয়ের নিয়মমাফিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়, তার শিক্ষা স্কাউটিং মাধ্যমে দেওয়া হয়।

স্কাউট-র জনক হলেন - 'লর্ড রবার্ট স্টিফেন্‌সন স্মিথ বেডেন পাওয়েল' (Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell), সংক্ষেপে 'বেডেন পাওয়েল' বা বি.পি.। তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ ২২ শে ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা 'হাবার্ট জর্জ' ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও ধর্মযাজক। মাতা হেনরিয়েটা ছিলেন রত্নগর্ভা (আট সন্তানের জননী) ও তাঁর পিতার সুযোগ্যা সহধর্মিনী। বেডেন পাওয়েল-র বয়স যখন মাত্র ৩ বছর, তখন অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিঃ তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ফলে তখন থেকেই তিনি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে কন্টকাকীর্ণ পথ চলা শুরু করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে "ARMY ENTRANCE" পাস করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে ভারতে আসেন। তাঁর দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা তাঁকে লখনউ সেনা রেজিমেন্টের সাব-লেফটেন্যান্ট পদে উন্নতি করে। ১৮৯৯ - ১৯০০ খ্রিঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাফেকিং শহরে অবরুদ্ধ হন কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনা 'বুয়র' যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এখান থেকে প্রথম ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন ও নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ২০ জন স্কাউট নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডের 'ব্রাউন সি আইল্যান্ডে' একটি পরীক্ষামূলক শিবির (Experimental Camp) শুরু করেন এবং সেখান থেকেই স্কাউটের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ১৯০৮ খ্রিঃ ১৫ ই জানুয়ারী তাঁর রচিত 'Scouting for Boys' প্রকাশিত হয়। তাঁর সৃজনশীল কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'SIR' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২০ খ্রিঃ ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'LORD' গোষ্ঠীভুক্ত করেন। ১৯৪১ খ্রিঃ এই মহান পুরুষ পরলোক গমন করেন।।

R.S.S. Baden powell মনে করতেন, 'মুক্ত বায়ুতে জীবন চর্চা করলে দেহ, মন ও আত্মা শক্তিশালী হয়'। স্কাউটদের শিক্ষাকেন্দ্র বা রণভূমি হল-উন্মুক্ত-প্রান্তর' - যেখানে স্কাউটরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে অথবা যেখানে স্কাউটরা চোখ মেললেই দেখতে পাবে দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ, হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে অফুরন্ত বুকভরা নির্মল বাতাস, আর পা বাড়ালেই পেয়ে যাবে নরম কার্পেট বিছানো তৃণভূমি। স্কাউট আন্দোলন বর্তমানে দেশ, জাতি ও বর্ণের সমস্তরকম সীমারেখা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে মানব সমাজের সৃজনশীল জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছে।

প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তথা অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গল, সাগর-মহাসাগরের অচেনা কে চেনার জন্য, অজানা কে জানার জন্য, সর্বোপরি প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য স্কাউটরা ভ্রমণে (Hike) অংশগ্রহন করে। স্কাউটরা প্রাত্যহিক পরোপকার (Daily Good Turn) ও 'Play Acting'-র মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার, সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করে। তিনটি স্তরে বিভক্ত (১। ৬-১০ বছরের ছাত্ররা কাবিং, ২। ১০-১৮ বছরের ছাত্ররা স্কাউটিং ও ৩। ১৯-২৫ বছরের ছাত্ররা রোভারিং) স্কাউটিং-র তিনটি মূল বাণী হল - ১। 'সাধ্যমতো চেষ্টা করো', ২। 'সর্বদা প্রস্তুত থাকো' ও ৩। 'সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করো'। স্কাউটিং-র প্রাথমিক শিক্ষা হল আত্মপ্রস্তুতির শিক্ষা এবং চরম পরিণতি হল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসারিত করা।

স্কাউট আন্দোলনের তিনটি নীতি হল - ১। ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য, ২। অপরের প্রতি কর্তব্য, ৩। নিজের প্রতি কর্তব্য। সেজন্য "SCOUT PROMISE" - এ বলা হয়েছে, "ON MY HONOUR, I PROMISE THAT I WILL DO MY BEST, TO DO MY DUTY TO GOD AND MY COUNTRY, TO HELP OTHER PEOPLE AND TO OBEY THE SCOUT LAW." এ-প্রসঙ্গে Baden Powell বলেছিলেন, ''যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দোষ কি? আমি অবশ্যই বলবো তা হল ''স্বার্থপরতা''। অন্যদিকে, স্কাউটদের অনুশাসন (Scout Law) হল ১। স্কাউট বিশ্বাসযোগ্য, ২। স্কাউট অনুগত, ৩। স্কাউট সকলের বন্ধু ও অন্য স্কাউটদের ভাই, ৪। স্কাউট বিনয়ী, ৫। স্কাউট জীবের বন্ধু ও প্রকৃতি প্রেমিক, ৬। স্কাউট নিয়মানুবর্তী ও সর্বসাধারণের সম্পত্তি রক্ষায় সহায়ক, ৭। স্কাউট সাহসী, ৮। স্কাউট মিতব্যয়ী, ৯। স্কাউট চিন্তা, বাক্যে এবং কর্মে সৎ ও পবিত্র।।

স্কাউট শিক্ষার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ভিত্তিক নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি (Syllabus) আছে, সেগুলি হল- ১। প্রবেশ, ২। প্রথম সোপান, ৩। দ্বিতীয় সোপান, ৪। তৃতীয় সোপান। প্রশিক্ষণ চলাকালীন স্কাউটরা তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মকুশলতা প্রদর্শন করে প্রায় শতাধিক Proficiency ব্যাজ (ফাস্ট এডার, পায়োনিয়ারিং, ফায়ার ফাইটার, ন্যাচারালিস্ট, পাথফাইন্ডার, ফটোগ্রাফার পেইন্টার, র‍্যাম্বলার, সয়েল কনজারভেশন, ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন, খেলাধূলা, জিমন্যাস্টিক, যোগব্যায়াম) ধারণ করতে পারে। তৃতীয় সোপান শিক্ষান্তে দক্ষ ও যোগ্য স্কাউটরা রাজ্যস্তরে 'রাজ্য পুরস্কার' পায়। স্বয়ং রাজ্যপাল রাজভবনে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রদান করেন। অতঃপর জাতীয় স্তরে দিল্লীতে এক বর্ণাঢ্য সমাবেশে ভারতের প্রশাসনিক প্রধান রাষ্ট্রপতি মহাশয় এই 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' প্রদান করেন।

১৯০৯ সালে ক্যাপ্টেন টি. এইচ. বার্কের তত্ত্বাবধানে ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান 'স্কাউট ট্রুপ' খোলা হয়। ১৯১০ সালে কলকাতার তৎকালীন চিফ্ সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কর্নেল জে উইলসন এবং স্যার অ্যালফ্রেড পিকফোর্ডের উদ্যোগে বাংলায় প্রথম 'কলিকাতা বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে সতীশ চন্দ্র মিত্র (হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ও ছোট আদালতের জজ) নেতৃত্বে প্রথমে 'Bengali Boy Scout Association' ও অতঃপর 'Bengali Boy Scout League' নামকরণ করে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন সংঘ ও সংস্থার তত্ত্বাবধানে স্কাউটিং চলত। সেগুলি হল - বয়েজ লিগ অব অনার, দি সেন্ট্রিস, বয় স্কাউট অব মাইসোর, বয় স্কাউট অব বরোদা, বয় স্কাউট অব বেঙ্গল (1918 খ্রিঃ), সেবা সমিতি বয় স্কাউট প্রভৃতি। ১৯১৮ সালে 'Bengali Boy Scout League' নাম পরিবর্তন করে "Boy Scouts of Bengal" নামে একটি নতুন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন গভর্নর অব বেঙ্গল লর্ড রোলান্ড শ এবং সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজধিরাজ মাননীয় বিজয়চন্দ মহতাব।

১৯২১ সালে ভারতে "All India Boy Scouts Association" গঠিত হয় এবং ঐ বছর ১৫ ই মার্চ হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ও মোহনবাগানের সেন্টার ফরওয়ার্ড ফুটবলার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (স্কাউট মাষ্টার) তার প্রথম সাধারণ কর্মসচিব পদে নির্বাচিত হন, যা বাঙালীর গর্বের বিষয়। উল্লেখ্য, ১৯১৬ সালে ভারতীয় বালিকাদের নিয়ে মহারাষ্ট্রের পুনেতে 'India Girl Guide' - র শুভ সূচনা হয়। ১৯১৭ সালে লেডি অবলা বসু (প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর সহধর্মিনী) গার্ল গাইডদের প্রথম ভারতীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত লর্ড বেডেন পাওয়েলের সহধর্মিনী লেডি ওলভি বেডেন পাওয়েল ছিলেন 'World Chief Guide'। বিশ্বস্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েলের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ও নিয়মিত পত্রালাপ চলত। বেডেন পাওয়েল কবিগুরুকে 'শ্রদ্ধেয় স্যার রবীন্দ্রনাথ' এইরূপ সম্বোধন করে পত্র লিখতেন। কবিগুরুর অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা নিয়ে ১৯২১ সালের ২৮ শে জানুয়ারী পাওয়েল দম্পতি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করেন। ১৯২১ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ভারতের স্কাউট আন্দোলনের এক স্বর্ণময় দিন। ঐদিন বেডেন পাওয়েলের সভাপতিত্বে মাদ্রাজের রাজ্যপাল ভবনে ভারতের সমস্ত স্কাউট সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, পন্ডিত জওহর লাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আব্দুল গফ্‌ফর খান, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ডঃ জাকির হোসেন, ভি.ভি. গিরি, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, মোরারজি দেশাই, নিলম সঞ্জীব রেড্ডি, জ্ঞানি জৈল সিং, রাজীব গান্ধি, আর ভেঙ্কট রামন, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, চন্দ্রশেখর, দেবেগৌড়া, ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা, কে.আর. নারায়নন, অটল বিহারী বাজপেয়ী, শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধি, এ.পি.জে. আব্দুল কালাম, ডঃ মনমোহন সিং, শ্রীমতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ এবং ডঃ অ্যানি বেশান্ত, জর্জ অরুন ডালে, পন্ডিত মদন মোহন মালব্য, পন্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, পন্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ী, বিচারপতি ভিভিয়ান বসু-র মতো মহান ব্যক্তিত্বরা স্কাউটিং-র সূচনা লগ্ন থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং স্কাউটিং-র সাফল্য কামনা করেছেন।

শিক্ষাজগতে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় শিক্ষামন্দির 'বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল' পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে যেমন স্বর্ণালোক বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত, ঠিক তেমনি স্কাউট শিক্ষার প্রসার ও দেশাত্মবোধে সর্বাগ্র ভূমিকা গ্রহন করেছে। সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় (Scout Master) নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে বর্ধমান শহরে সর্বপ্রথম আমাদের স্কুলে স্কাউট শুরু হয়। ১৯২৮ সালের ২৬ শে মে বর্ধমানের 'TOWN HALL' - এ Scouts Day পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন District Magistrate Mr.Macferson (মিঃ ম্যাকফারসন)। ১৯২৭-১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়ের স্কাউটের দায়িত্বে ছিলেন সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, সুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য, ফকির চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ শিক্ষক মহাশয়বৃন্দ। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্যালয় থেকে Scout উঠে যায়। অতঃপর ১৯৭৪ সালে দীনেশ চন্দ্র চতুর্ব্বেদী ও নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় Scout Master - র Training গ্রহন করেন। ১৯৭৯ সালে মাদ্রাজে 8th All India Jamboree -তে দীনেশ বাবু ও নগেন বাবু Scouts দের নিয়ে যোগদান করেন, যেখানে Commonwealth ভুক্ত দেশের Scout রা যোগদান করেন। উল্লেখ্য, এই Jamboree -তে West Bengal স্কাউট মাষ্টারদের মধ্যে মাত্র চারজন Sub Camp Chief পদমর্যদা লাভ করেন, তাদের মধ্যে দীনেশ বাবু ছিলেন অন্যতম, তাঁর জন্য আমরা গর্বিত।

১৯৮০ সালে থেকে বিভিন্ন মহলের আপত্তিতে বিদ্যালয় থেকে Scouting শিক্ষা উঠে যায়। এরপর তিন দশক পরে সরকারের সদিচ্ছায় স্কুলশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে আবার Scout শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটছে। আমাদের মাননীয় প্রধান শিক্ষক ডঃ শম্ভুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ও মাননীয় সহ প্রধান শিক্ষক শ্রী অরুণাভ চক্রবর্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রয়াসে আমাদের বিদ্যালয়ের হারিয়ে যাওয়া Scout -এর স্মৃতি আবার ফিরে এল। ২৬ মে, ২০১২ থেকে ২ রা জুন, ২০১২ তারিখে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গের 'State Scout Training Centre', Kolkata তে আমি 'Scout Master'- র Training নিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ৪৮ জন ছাত্র Scout শিক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ, এবার বাস্তবায়নের অপেক্ষা। আমরা আমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবই - আমাদের ছাত্রদের 'সেরার সেরা' (Best among the best) করবই - সকলের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।।

শিল্পী ঃ তুলুজ লোত্রেক

"And to God the Almighty! Make my people sweat. Let their toil create many more Agnis that can annihilate evil. Let my country prosper in peace. Let my people live in harmony. Let me go to dust as a proud citizen of India, to rise again and rejoice in its glory."

– A.P.J. Abdul Kalam

সুনয়নী দেবী

সংহিতা মুখোপাধ্যায়
(পার্শ্ব-শিক্ষিকা)

‘সুনয়নী দেবী’ নামটি পাঠক মহলে প্রায়-অপরিচিত। অথচ ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িরই একজন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কিন্তু থেকে গেছেন কিছুটা অন্তরালেই।

প্রথমে তাঁর বংশ-পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলি। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দিগম্বরী দেবীর তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর বড় দাদা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগমায়া দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই অকালমৃত হন, কিন্তু রেখে যান ছয়টি উজ্জ্বল পুত্র-কন্যাকে। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সৌদামিনী দেবীর পুত্র-কন্যাদের নাম যথাক্রমে - গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়িনী দেবী, সুনয়নী দেবী ও কুমারেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুনয়নী দেবীর বিবাহ হয়েছিল কোলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র-বংশীয় ছিলেন। সুনয়নী দেবীর জন্ম হয় ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের১৮ই জুন (৫ই আষাঢ়) এবং মৃত্যু হয় ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতায় বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে।

সুনয়নী দেবী যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্প ছিল তাঁর রক্তে। তার উপর স্বামীর নিয়ত অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা তাঁর অন্তর্নিহিত শিল্পীচিত্তের যথাযথ বিকাশ ঘটিয়েছিল। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। ঠাকুরবাড়িতে নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। পরিবারের সদস্যরাই তাতে অংশগ্রহণ করতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো সংগীতশিল্পী ছিলেন তিনি। ভালো পিয়ানো সেতার ও এস্রাজ বাজাতেন। পরিবারের মেয়েদের অভিনয় ও সংগীত শেখাতেন। লিখতেন গান এবং কবিতাও। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল চিত্রশিল্পে। বাল্যকালে গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র - এই দুই দাদার দেখে তুলি ধরেছিলেন। তিনি এবং ক্রমশঃ হয়ে উঠেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগের নব্য ভারতীয়, মতান্তরে নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার একজন বিশিষ্ট শিল্পী। এমন একজন মানুষের প্রামাণ্য জীবনীর অভাব আছে এবং সুনয়নী দেবী-সম্পর্কিত তথ্যগুলি ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আছে। সেই সব তথ্য যথাসম্ভব চয়ন করেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার এই লেখাকে সাজিয়েছি।

সেটা ১৮৯৬ সাল। সেই বছরের ৬ই জুলাই আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল এসে যোগ দিলেন কোলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে। কোলকাতায় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট’ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে হ্যাভেল সাহেবের সরকারি শিল্প শিক্ষা বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের শিল্পশিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় শিল্পপদ্ধতিতেই শিক্ষিত হতেন এবং সেটাই সবাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল এসে বললেন উল্টো কথা। ১৮৮৪ সাল থেকে প্রায় এক দশক মাদ্রাজের গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁকে দক্ষিণ ভারতের কিছু পরম্পরাগত শিল্পের অনুসন্ধানের কাজ করতে হয়েছিল। সংবেদনশীল হ্যাভেল তখন থেকেই ভারতীয় কলাশিল্পের আত্মিক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে সাউথ কেনসিংটন স্কুলে অ্যাকাডেমিক রীতিতে চিত্রশিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু হুবহু প্রকৃতির অনুসরণ করে অতিরিক্ত বাস্তবতার ভাব বজায় রেখে ছবি আঁকার মধ্যে তিনি কোন তৃপ্তি খুঁজে পাননি। তিনি খুঁজছিলেন কলাশিল্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশকে, যা তিনি পেয়ে যান ভারতীয় মূর্তিকলা ও কারুশিল্পে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন। তাই, তিনি যোগদানের পর নতুন রেগুলেশনের সাহায্যে কোলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের পাঠ্যক্রমকে

নতুন করে সাজান এবং গিলার্ডি সাহেব অবসর নিলে তাঁর জায়গায় উপাধ্যক্ষ পদে আহ্বান জানান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হ্যাভেলের আহ্বানে অবনীন্দ্রনাথ যোগ দিলেন সরকারি আর্ট স্কুলে। সূত্রপাত হয় ভারতীয় শিল্পের এক নতুন যুগ। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব কলকাতায় আসার আগে থেকেই ইউরোপীয় শিল্পপদ্ধতিতেই শিক্ষিত অবনীন্দ্রনাথ নিজস্ব পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। কিছু আইরিশ ছবি এবং মুঘল মিনিয়েচারের নিদর্শন দেখার পর তিনি অনুভব করেন, মিনিয়েচার ছবিতেই ঘটতে পারে তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুযায়ী তিনি বিষয়বস্তু ঠিক করেছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। তারপর তিনি স্বল্পায়তনের পটে আঁকলেন তাঁর বিখ্যাত 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজ। হ্যাভেল সাহেব কোলকাতায় আার আগেই, ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দেই এই ছবিগুলি অঙ্কিত হয়। অবনীন্দ্রনাথের এই 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজ দেখার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে হ্যাভেলের পরিচয় হয় ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁরা একত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় কলাশিল্পের অনুশীলন করেন।১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ - এই দশ বছর বাংলার চিত্রকলা জগতের প্রধান পুরুষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এই সময় হ্যাভেল সাহেবের চেষ্টায়, ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় এবং অবনীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা, শ্রম ও সাধনায় গড়ে ওঠে এক নতুন ভারতীয় শিল্প ঘরানা, যে ঘরানার অ্যতম প্রধান শিল্পী ছিলেন সুনয়নী দেবী; যাঁর জীবন ও সাধনার কথা অল্প লোকেই জানে।

তাঁর আঁকা ছবি আমি প্রথম দেখি কোলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের সংগ্রহশালায়। তখন আমি সুনয়নী দেবীর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিচয় জানতাম না। আমাকে শুধুমাত্র আকৃষ্ট করেছিল তাঁর আঁকা ছবির স্নিগ্ধ, মনজুড়ানো, অপার্থিব সৌন্দর্য। দুই দাদাকে দেখে নিজের মত করে ছবি আঁকার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। আঁকতে শুরু করার পর মাঝে মাঝে তাঁদের কাছেই দেখিয়ে নিতেন। তবে, ছবি আঁকা শেখার ব্যাপারে তাঁর শিক্ষাগুরু কেউ ছিলেন না। তাঁকে এব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত বলা চলে। ছোটবেলায় বাড়িতে রবি বর্মার ছবি দেখলেও প্রভাবিত হননি। তবে, লোকশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, যেমন - খেলনা, ছোটদের পুতুল ইত্যাদি তাঁর ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। ক্রমে তাঁর আঁকা ছবি দেখে খুশি হয়ে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন - ''ওকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও।'' শুনে কোলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন - ''ও যে ধারার ছবি আঁকছে তার জন্য আমায় আর সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে না। পরে দেশের লোকের কাছ থেকে ও নিজেই সার্টিফিকেট আদায় করে নেবে।'' সুনয়নী দেবীর 'ছোড়দা'র এই কথা সত্য হয়েছিল; মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই চিত্র শিল্পী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন তিনি।

চিরায়ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে লোকশিল্পের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব চিত্রশৈলী, যা ছিল তাঁর দুই বিশ্বখ্যাত শিল্পী দাদার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু ছবি আঁকার পদ্ধতি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন অবনীন্দ্রাথ ঠাকুর প্রবর্তিত 'ওয়াশ টেকনিক' বা 'ধৌত চিত্ররীতি'কে, এবং তাঁর আঁকার মাধ্যম ছিল জল রং। পটশিল্পের ঢঙে তিনি আঁকতেন রাধা, কৃষ্ণ, বালগোপাল, শিব, পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ফিরিওয়ালা, বর-কনে, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদির ছবি। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে 'অর্ধনারীশ্বর' ছবিটি বিখ্যাত। সাধারণ জনজীবনকে বিষয়বস্তু করেও ছবি আঁকতেন তিনি। প্রকৃতি থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা তাঁর ছবিগুলির মধ্যে ঘোড়ার ছবিটি ব্যতিক্রমী। পোট্রেটও এঁকেছেন তিনি।

গৃহীসত্তা ও শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্ব থেকে সুনয়নী দেবীও মুক্ত ছিলেন না। বিরাট যৌথ পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন তিনি। বীণা, প্রভাতী, অনুজা, রতনমোহন, মনোমোহন, সুমোহন ও শ্রীমোহন - যথাক্রমে এই সাতটি পুত্র-কন্যার জনক-জননী ছিলেন রজনীমোহন ও সুনয়নী। বৌমা ও নাতবৌদের ছবি আঁকা শেখাতেন তিনি। তাঁদের পঞ্চম সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী মণিমালা দেবীও ছবি আঁকতে শিখেছিলেন তাঁর শাশুড়ির কাছে। তিনি জানিয়েগেছেন, নীচে খাবার ঘরে একটি বড় তক্তাপোশের একধারে তুলি, রাশিকৃত কাগজ ও রং সাজানো থাকত, অন্য ধারে থাকত তাঁর হিসেবের বাক্স, খাতা সরঞ্জাম। তিনি ছবি আঁকতেন, বিভিন্ন সাংসারিক নির্দেশ দিতেন, তাঁর বৌমারা তাঁর সামনে বসে তরকারি কুটতেন। মণিমালা দেবী বলেছেন - ছবিতে রং দেওয়ার পর তাঁর শাশুড়ি তাঁকে সেটি বার বার জলে ভিজিয়ে আনতে বলতেন। তারপর সেই জলে ভেজা ছবির দিকে অপলক নেত্রে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। ঐ জলে ভেজা ছবির মধ্যে তাঁর ধ্যাননেত্রে যে রূপটি দেখতে পেতেন, তাকেই তিনি ছবি করে ফুটিয়ে তুলতেন। এইভাবে এই সঙ্গে চলত তাঁর সংসার পরিচালনা ও ছবি আঁকা। কিন্তু, দুর্ভাগ্য এই যে, ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর স্বামী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিন ক্রমশঃ ছবি আঁকা ছেড়ে দেন। মনোমোহন ও মণিমালা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তাঁর

দিদির অটোগ্রাফের খাতায় আঁকা সরস্বতীর ছবিটি সুভো ঠাকুরের 'সুন্দরম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এটিই সুনয়নী দেবীর আঁকা শেষ ছবি হিসেবে ঘোষিত হয়। এই ছবিটি আঁকার সময় তাঁর বয়স সত্তরের উর্দ্ধে। কিন্তু, কিশোর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৯৩৬ সালের পর থেকেই সুনয়নী দেবীর আঁকা ছবির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়; হয়ত রং, তুলি, কাগজ ইত্যাদি কিনে দেওয়ার মানুষটি আর ছিলেন না বলেই। তাঁর স্বামীই তাঁকে প্রথম নিজস্ব ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেন বলে সুনয়নী নিজে জানিয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর বেঁচেছিলেন; কিন্তু এই পর্যায়ে আঁকা তাঁর ছবির সংখ্যা কম। মোটামুটিভাবে, তাঁর তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি চিত্রিত হয়। কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের দাদা মনীষী চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় লেখিকা লীলা মজুমদারের মেয়ে কমলা দেবীর সঙ্গে। সেই সূত্রে এই পরিবারে যাতায়াত ছিল লীলা মজুমদারের। তিনি সুনয়নীদেবীকে কয়েকবার দেখেছিলেন। তিনি সুনয়নী দেবী সম্পর্কে বলেছেন, - ''একদিন দেখি চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে কেবলই ডান হাতটা কব্জি থেকে নাড়ছেন। ভারি কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করাতে, চোখ খুলে, হেসে বললেন, মনে মনে ছবি আঁকছি। হাত তো আর তুলি ধরতে পারে না।''

বালিকা বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তখনকার দিনে তাঁর পক্ষে আজকের মত ছবি আঁকাকে পেশা হিসেবে ভাবার কোন প্রশ্নই ছিল না। উপরন্তু, তিনি ছবি আঁকতেন আপন খেয়ালে, তারপর বিলিয়ে দিতেন। তিনি কখনও নিজের ছবি সংরক্ষণ করে রাখার কথা অথবা প্রদর্শনী করার কথা ভাবেন নি। তাই তাঁর আঁকা ছবিগুলির সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন।

তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল টানা, দীঘল মায়াবী চোখ ও লম্বা আঙুল। তাঁর পরবর্তীকালের শিল্পী যামিনী রায়ের ছবিতেও এমন টানা চোখের সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। সংগীত শিক্ষার কারণে গীতিময়তা তাঁর ছবিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল। তাঁর ছবি দেখে মুগ্ধ স্টেলা ক্রামরিশ ও নোরা উটেনবার্গ সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর ছবি দেখে স্টেলা ক্রামরিশ বলেছিলেন, "The tree does not know how it's flowers come, the bird does not know how it sings from where its songs come. It comes from a life force. It is the same life force that makes an artist like Sunayani Devi to paint." তাঁর মতে, She was the India's first modern woman painters. স্টেলা ক্রমরিশের মতে সুনয়নী দেবীই ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মহিলা চিত্রশিল্পী।

লণ্ডনের উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্লাব ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেখানে সুনয়নী দেবীর পুত্র মনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর মায়ের কয়েকটি ছবি প্রদর্শনীর জন্য দেন। সেই প্রদর্শনীর ক্যাটালগে লণ্ডনে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের কন্যা নোরা উটেনবার্ক সুনয়নী দেবী সম্পর্কে একটি Article লেখেন। কোলকাতায় এসে সুনয়নী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর নোরা লেখেন - "I can not forget these paintings that have come from far away, these women with their lotus eyes. The colours are enchanting and the paintings give the impression of having been executed a long time ago on the walls of a cave. Although the paintings are small they give the impression of being like murals filling the wall." 1977 এর ফেব্রুয়ারীতে University of Women's Association -এ কিশোর ও মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর ছবির একটি বড় মাপের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 1982 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ Alliance Francais এ কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুনয়নী দেবীর ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের মেলবন্ধন করে একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই আসরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গেয়েছিলেন বাণী ঠাকুরের পরিচালনায় 'কিংশুক'-এর সদস্যগণ। এছাড়াও ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে অবনীন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতায় কিশোর চট্টোপাধ্যায় বলে গেছেন তাঁর ঠাকুমা সুনয়নী দেবীর কথা।

মৈত্রেয়ী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে একত্রে দেখেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের আলাপচারিতা শুনেছেন। তিনি লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে - ''একদিন আলোচনা হচ্ছিল লোকশিল্প সম্বন্ধে - আমার মনে পড়ে সেদিন সেখানে সুনয়নী দেবীর পটের মত ঢঙে চিত্রিত আশ্চর্য সুন্দর ছবিগুলি ছিল।

ওঁরা বলছিলেন সুনয়নী দেবী ফিরে গেছেন সেই উৎসে যেখানে মানুষ অকৃত্রিম স্বভাব-সৌন্দর্যে উদ্বুদ্ধ।''

স্বদেশের শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে জি. ভেঙ্কটচলম লিখে গেছেন তাঁর কথা। মালবী ঠাকুর 'সুন্দরম্' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একটি

প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সম্পর্কে একটি জীবনীমূলক প্রবন্ধ লেখেন সুশীল রায়, ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁর বই 'Saraniya' (Luminaries) -তে। কমল সরকার সুনয়নীদেবীর নামটি অন্তর্ভুক্ত করেন 'Encyclopedia of Indian Art'-এ। মীরা মুখোপাধ্যায়, আমিনা কর প্রমুখ শিল্পীগণ লিখেগেছেন তাঁর কথা। কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স 'কমলালয় স্টোর্স' - এ তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে লেডি রাণু মুখার্জী অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ -এ তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পার্থ মিত্র এবং তপতী গুহ ঠাকুরতাও লিখেছেন সুনয়নী দেবীর অঙ্কন রীতি নিয়ে। দেশে ও বিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হলেও ছবি বিক্রি করার কথা তিনি ভাবেননি কখনও; যদিও ১৯৬২ সালে লণ্ডনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁর একটি ছবি বিক্রি হয়।

সহজ সরল মন নিয়ে জীবন ও প্রকৃতিকে দেখতেন সুনয়নী; সেই পবিত্র সারল্যের স্পর্শ আছে তাঁর প্রতিটি ছবিতে। কিন্তু তাঁর তুলির টানে কোনও দুর্বলতা ছিল না। ছবিতে সুনয়নী দেবীর যে নিজস্ব স্টাইল ফুটে উঠেছে, তা অনেকটা তাঁর ব্যক্তি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। জানা যায়, তিনি ছিলেন নম্র, কোমল, শান্ত, উদার, সরল ও গভীর মনের মানুষ। তাঁর ছবিতেও এই সকল ভাবগুলি অনুভূত হয়। এমন অনন্য ধ্রুপদী চরিত্রের মানুষ আজকের যুগে বিরল।

তাঁর সমকালীন অনেক নারীই ছবি আঁকতেন, কিন্তু নিজস্ব চিত্রশৈলী নির্মাণ করে শিল্পী হয়ে ওঠার দুর্গম পথে প্রথম চলেছিলেন সুনয়নী দেবীই। তাই তাঁকে ভারতীয় নারী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অগ্রপথিক বলা চলে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তথ্যসূত্র ঃ-

১। কিশোর চট্টোপাধ্যায়

২। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

৩। দেব চিত্রা, ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, আগষ্ট ২০০৪, প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ।

৪। ভট্টাচার্য অশোক, বাংলার চিত্রকলা, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০ শে মে, ১৯৯৪।

৫। দেবী মৈত্রেয়ী, স্বর্গের কাছাকাছি, কলিকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, তৃতীয় প্রকাশ, অগষ্ট ১৯৮৯।

৬। ললিতকলা অ্যাকডেমিতে প্রদত্ত কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনীন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা'।

সংগ্রহ ঃ-

১। ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী, চেন্নাই

২। শ্রী চিত্রা আর্ট গ্যালারী, তিরুবনন্তপুরম, কেরল

৩। জগমোহন প্যালেস, মাইসোর

৪। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ

৫। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম, কলকাতা

৬। একাডেমী অব ফাইন আর্টস্, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। The Triumph of Modernism : India's Artists and the Avant Grade, 1922-1947 by Partha Mitra.

২। ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলা, আর. পি. জি. চিত্রমালা, সম্পাদনা ঃ শংকর, কলকাতা, ১৯৯১

সম্পাদকের সংযোজন ঃ-

সুনয়নী দেবীর চিত্রকলা প্রদর্শনী

১৯০৮ - ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, কলকাতা

১৯১১ - যুক্ত প্রদেশ, আয়োজক ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টার আর্ট, কলকাতা

১৯১১ - ফেস্টিভ্যাল অব এম্পায়ার, আয়োজক ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টার আর্ট, কলকাতা, উপলক্ষ্য রাজা পঞ্চম জর্জের করোনেশন, স্থান ক্রিস্টাল প্যালেস, লণ্ডন

১৯২৪- ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, আয়োজক ইণ্ডিয়ান ও আমেরিকান ফেডারেশন অব আর্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২০০৪ - ম্যানিফেস্টেশনস্ - II, আয়োজক - দিল্লি আর্ট গ্যালারী, জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারী, মুম্বই ও দিল্লি আর্ট গ্যালারী, নিউ দিল্লি

জানার কথা

কঙ্কালেশ্বরী ঃ অষ্টভুজা এই রহস্যময় মূর্তিটি কাঞ্চননগরে পাওয়া যায় দামোদরে ১৩২০ সনের বন্যার পর। সম্ভবত হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষাকারিনী এই কঙ্কালসার ভয়ংকরী মূর্তি কোন কৌমধর্মের দেবী। হয়তো রঙ্কিনী। প্রাচীন বর্ধমান জনপদের মিশ্রধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন এই নবম-দশম শতাব্দীর মূর্তি।

ব্রহ্মপুত্র

কৌশিক রায় (শিক্ষক)

ভারতীয় উপমহাদেশে অধিকাংশ নদীর নাম স্ত্রী লিঙ্গ বাচক শব্দ; কয়েকটি ব্যতিক্রমের অন্যতম ব্রহ্মপুত্র ('ব্রহ্মা'-এর পুত্র)। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস মতে, তিন তরুণ তাপস ও এক যোগিনী পিতামহ ব্রহ্মার আশীর্বাদ নিয়ে মানস থেকে পবিত্র জল নিয়ে আপন অঞ্জলিবদ্ধ করে যাত্রা শুরু করে; যাত্রার পূর্বে তারা সাত বার কৈলাস-মানস প্রদক্ষিণ করে। এরা ভয়ঙ্কর পর্বত অতিক্রম করে উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে যাত্রা করে আর ভারতে প্রবেশ করে যথাক্রমে সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নামে; যোগিনী যাত্রা করে দক্ষিণে কর্ণালী নদী রূপে।

তিব্বতি পুরাণ মতে, মানস সরোবর (Tso Mapam) থেকে লান্‌চেন্ খাম্বাব (হস্তিমুখ শতদ্রু), সাঙ্গে খাম্বাব্ (সিংহমুখ সিন্ধু), তাম্‌চেক্ খাম্বাব্ (অশ্বমুখ ব্রহ্মপুত্র) এবং মাপ্‌চা খাম্বাব্ (ময়ূরমুখ কর্ণালী) নির্গত হয়েছে।

আসামের উত্তর-পূর্ব অংশে (আজকের অরুণাচল প্রদেশ) স্থানীয়দের বিশ্বাস ছিল লোহিত নদীই হল ব্রহ্মপুত্রের মূল অংশ যার উৎস ব্রহ্মকুন্ডে। ১৭৬৪ সালে ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার জেমস রেনেল পূর্ব ভারতে কাজ শুরু করেন। ১৭৮৮ সালে রেনেল তাঁর মানচিত্রে তিব্বতের সাংপোকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে জুড়ে দেন। তাঁর যুক্তি ছিল সমুদ্র থেকে প্রায় চার শত মাইল দূরে যে নদীতে এত জল তার উৎস বহুদূরে হবে; এত কাছে নয়।

তিব্বতে প্রবাহিত সাংপো (Tsamgpo অথবা Yarlang Zangbo) এর অস্তিত্ব মানুষ জানতো; কিন্তু সাংপোই যে ব্রহ্মপুত্র তা প্রত্যক্ষভাবে জানার উপায় ছিল না। ১৮২৫ সালে ফিলিপ বর্লটন ও রিচার্ড বেডিং ফিল্ড জরিপ শুরু করলেন। আবার উইলকক্স নামে এক সহকারীকে নিয়ে ১৮২৬ সালে জরিপ শুরু করলেন স্বয়ং সার্ভেয়ার জেনারেল বেডফোর্ড। এঁদের পর্যবেক্ষণ ছিল - লোহিত নদী আসছে ব্রহ্মকুন্ড থেকে, ডিহং ও ডিবং আসছে হিমালয়ের ভিতর থেকে; তবে ডিহং নদীর জলধারা অনেক বেশী জল বহন করছে অন্যদের তুলনায়। কাজেই ব্রহ্মপুত্রের মূল অংশ ডিহং; প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী লোহিত নয়। সুতরাং ডিহং-এর গতিপথ অনুসরণ করতে হবে। তখনকার দিনে নদীর গতিপথ অনুসরণ করে উৎস সন্ধান করতে হত। কিন্তু দেখা গেল ডিহং এতই গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করে প্রবাহিত যে এর গতিপথ অনুসরণ করা অসম্ভব।

বিকল্প ব্যবস্থা বলতে তিব্বতের সাংপো নদীর গতিপথ অনুসরণ করা ; কিন্তু ব্রিটিশ সার্ভেয়ারদের কাছে তিব্বত এক নিষিদ্ধ দেশ। তিব্বতী প্রশাসকরা ইউরোপীয়দের প্রবেশ করতে দিত না। তিববতে জরিপকারীদের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী অথবা ভোটিয়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রবেশ করতে হত। এ ব্যাপারে অসামান্য অবদান ছিল সার্ভে বিভাগের কর্মচারী নৈন সিং-এর; (সার্ভে বিভাগের প্রথামত নৈন সিং-এর ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল পন্ডিত -১)। তিনি নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করে ভোটিয়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একদল নেপালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিব্বত প্রবেশ করতে পারেন (২৪ শে আগষ্ট, ১৮৬৫)। নৈন সিং পৌঁছে গেলেন সাংপোর তীরে। লক্ষ্য তো ব্যবসা নয়, জরিপ করার উদ্দেশ্যে তাঁর তিব্বত প্রবেশ। কম্পাস, সেক্সট্যান্ট, থার্মোমিটার ইত্যাদি ছোট ছোট যন্ত্র লুকানো তার আলখাল্লার অন্দরে। তিব্বতি প্রশাসকদের সীমান্তরক্ষীরা দেখছে এক ভোটিয়া 'ওঁ মনিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র জপ করতে করতে জপমালার গুটি সরাতে সরাতে হাঁটছেন; বাস্তবে একটি করে গুটি সরছে আর নৈন সিং - এর পা পড়ছে একটা করে; মন্ত্রটা কেবল উপলক্ষ্য। বাঁ পা থেকে আবার বাঁ পা ফেলার মধ্যের ব্যবধান সাড়ে একত্রিশ ইঞ্চি; এভাবে দুই হাজার পা এক মাইল। এভাবে সাংপোর তীর বারবার সিগাৎসে এবং দেশ ছাড়ার এক বছরের মাথায় লাসা তে পৌঁছেছিলেন। কেমন দক্ষ ছিলেন নৈন সিং? একটি উদাহরণই যথেষ্ট - প্রতি সন্ধ্যায় নৈন সিং তাঁবু থেকে দূরে আগুন জ্বালিয়ে ধ্যান করেন আর পথের সঙ্গীরা এমন ধার্মিক সহযাত্রীকে পেয়ে বেজায় খুশী। ধার্মিক আসলে ধুনিতে কাঠের আগুনে জল ফুটিয়ে তাপমাত্রা দেখছেন আর সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে ধ্রুবতারার উন্নতির কোণ মেপে অক্ষাংশ নির্ণয় করছেন। এভাবে নৈন সিং ফুটন্ত জলের উষ্ণতা হিসাব করে লাসার উচ্চতা ১১,৭০০ ফুট (বর্তমানে প্রায় ১২,০০০ ফুট বলে স্বীকৃত) এবং লাসার অক্ষাংশ ২৯°৩৯/১৭// উঃ বের করেছিলেন (যার প্রকৃত মান ২৯°৪১/ উঃ)। যদিও নৈন সিং - এর উদ্দেশ্য ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধান ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল মানস সরোবর সংলগ্ন অঞ্চলের সমীক্ষা।

১৮৭৮ সালে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার লেঃ হেনরি হারম্যান নিযুক্ত করলেন এক সিকিমী কুলি সর্দার - নৈম সিং যার ছদ্ম নাম GMN (NAIM SING), এবং কিন্‌থুপ নামে এক সিকিমী কুলিকে। এঁরা সাংপোর তীর বরাবর হেঁটে নেমে আসবেন। এঁরা তিব্বতে পৌঁছে সাংপো ধরে পূর্ব দিকে চলতে থাকলেন। একটি স্থানে পৌঁচ্ছে এঁরা দেখলেন যে সাংপো,

নামচা বারোয়া ও গিয়াল পেরি নামে দুই পর্বতের মাঝের গিরিখাত দিয়ে প্রবাহিত। স্থানীয় লোকেরাও তাই জানালো। এঁরা আর অগ্রসর হতে না পেরে ফিরে এলেন।

কিন্তু লেঃ হারম্যান জনশ্রুতির তথ্যে সন্তুষ্ট নন। তাঁর প্রমান চাই যে - সংপোই ব্রহ্মপুত্র। তিনি নতুন পদ্ধতির কথা ভাবলেন, পায়ে হেঁটে যদি না যাওয়া যায় তাহলে সাংপো তে কাঠের টুকরো ফেলা হবে আর আসামে ব্রহ্মপুত্রের জলে নজর রাখা হবে। কাঠের টুকরোগুলি প্রমান করবে দুটি নদী এক কি না।

এবার কিন্থুপ বিশেষভাবে তৈরী পাঁচশটি কাঠের টুকরো নিয়ে যাবেন। একটি নির্দিষ্ট দিন থেকে রোজ পঞ্চাশটা করে কাঠের টুকরো ধেমু চাম্নক্ থেকে সাংপোর জলে ফেলা হবে। এক মঙ্গোলিয়ান লামার সঙ্গে কিন্থুপ যাবেন; লামা মঙ্গোলিয়ান যাচ্ছেন, পথে কিন্থুপের উপর নজর রাখবেন এর জন্য লামাকে নগদ দক্ষিণাও দেওয়া হয়েছিল।

এই লামা নামেই সন্ন্যাসী, আসলে মানুষের যতরকম চারিত্রিক দোষ থাকতে পারে, সবগুলিই তাঁর মধ্যে ছিল। তিব্বতে ঢোকার আগেই মদ আর জুয়াতে নিজের সব অর্থ এমনকি কিন্থুপের সর্বস্ব চলে গেল। এঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন ৭ই আগষ্ট, ১৮৮০; এর পর লাসা পৌঁছে সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু হল। সেতাং - এ এসে লামা অসুস্থ হয়ে তিনমাস বিছানায়। ঘোড়ার ঘাস কেটে আর মজুর খেটে কিন্থুপ নিজের ও লামার দিন চালাতে থাকেন। যাই হোক 'লামা' হচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি!

লামা সুস্থ হলে আবার যাত্রা শুরু হল। একমাস ধরে সাংপোর গতিপথ অনুসরণ করা হল। কখনও গুহায়, কখনও গুম্ফায় আবার কখনও ধর্মশালায় রাত্রি কাটে। পথে সর্বদাই হিংস্র জন্তু বা দস্যুর ভয়। এর মাঝে লামা আবার অঘটন ঘটান এবং জরিমানা। বেচারী কিন্থুপ দিনমজুরী করে চারমাসের চেষ্টায় পঁচিশটি মুদ্রা দিয়ে লামাকে মুক্ত করেন। এভাবে প্রায়৭-৮ মাসের প্রচেষ্টায় পেমক চং-পৌঁছে একটি সেতু পার হতে দরকার হল বিশেষ অনুমতি পত্র। লামা ওপারে গেলেন অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে। কিনথুপ রইলেন এপারে লামার অপেক্ষায়। চারদিন পর লামা ফিরে এসে কিন্থুপকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তার বাড়ীতে। প্রথমেই কিন্থুপের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল দিক্ নির্দেশক কম্পাস আর আত্মরক্ষার পিস্তল। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিন্থুপ দেখলেন - লামা নেই, আর জিনিসপত্রও নেই। বাইরে বের হতে গিয়ে দেখলেন একই সঙ্গে বাড়ীর মালিক ও তার পোষা কুকুরগুলো তেড়ে এল। কিন্থুপ কে জানিয়ে দেওয়া হল একটি ঘোড়ার বিনিময়ে লামা তাকে বিক্রয় করে গেছেন। কিন্থুপ হল ক্রীতদাস। এইভাবে প্রায় সাতমাস ধরে মালিকের সেবা করে কিনথুপ বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি পেলেন কারণ তখন তিনি মালিকের আস্থা ভাজন। কিন্থুপ তাঁর লক্ষ্য পূরণে অবিচল; শত দুর্দশাতেও কাঠের টুকরোগুলি হাতছাড়া করেন নি।

শুরু হল নতুন অধ্যায় - কিন্থুপ তাঁর পোশাকের ভিতর কয়েকটি করে কাঠের টুকরো নিয়ে এক গুহায় লুকিয়ে রাখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে মালিকের বাড়ী থেকে তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন স্থানীয় গুম্ফার প্রধান লামা - আশ্রয়ও দিয়েছিলেন গুম্ফায়। প্রধান লামার অনুমতি নিয়ে কিনথুপ আবার যাত্রা শুরু করেন। রাস্তায় দেখা হয়ে যায় একদল সিকিমের বণিকদের সঙ্গে। নিরক্ষর কিন্থুপ বণিকদের মধ্যে লেখাপড়া জানা একজনকে অনুরোধ করে তাঁর দুর্দশা ও বিলম্বের কারণ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন; চিঠিতে জানালেন যে আগামী তিব্বতি দশম মাসের পাঁচ তারিখ থেকে দশদিন ধরে সাংপোতে পঞ্চাশটি করে কাঠের টুকরো ভাসাবেন।

১৮৮৩ সালের নভেম্বর মাসে কিনথুপ তাঁর কর্তব্য পালন করলেন এবং প্রায় চার বছর পর দেশে ফিরলেন। এসেই শুনলেন সংসারে তাঁর একমাত্র আপনজন মা মারা গেছেন তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে করতে। দার্জিলিং-এ এসে শুনলেন তাঁর কুলি সর্দার নৈম সিং প্রয়াত; হারম্যান সাহেবও দেহ রেখেছেন। তাঁর চিঠি পৌঁছায়নি; সাংপোতে ফেলা কাঠের টুকরোর খোঁজও কেউ রাখে নি। এক নিরক্ষর, দরিদ্র কিন্তু কর্তব্যে অবিচল কুলির চার বছরের প্রচেষ্টা অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে গেল।

এর প্রায় ৩৯ বছর পর ১৯২২ সালে লেঃ এরিক বেলি এবং ক্যাপ্টেন মর্সহেড অনুসন্ধান করে প্রমাণ করলেন যে সাংপোই ব্রহ্মপুত্র। লেঃ এরিক বেলি দার্জিলিং - এর এক বস্তির অন্ধকার ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কিন্থুপ কে খুঁজে বের করলেন এবং সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার কাছে কিন্থুপ এর কাজের স্বীকৃতি দাবী করলেন। এরপর কিন্থুপকে সিমলায় নিয়ে গিয়ে এক হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরে কিন্থুপ মারা যান।

পরবর্তী কালে চিত্রসহ নানা আধুনিক উপকরণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত তিব্বতি পুরাণের 'তামচেক্ খাম্বাব' বা 'সাংপো'ই ভারতে 'ব্রহ্মার পুত্র'-ব্রহ্মপুত্র। মানস সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে চেমায়ুং দুং হিমবাহ থেকে সাংপোর উৎপত্তি; এই উৎসস্থল খুঁজে বের করার কৃতিত্বও এক ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের যিনি ১৯৩০ সালে এই কাজ করেছিলেন। 'সার্ভে অফ্ইন্ডিয়া' স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আঁকা মানচিত্র নির্ভুল বলে গ্রহণ করে।

লণ্ডনের 'রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' তাঁকে 'ফেলো' মনোনয়ন করে।

সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৫২১০ মিটার উচুঁতে চেমায়ুং দুং হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়েছে (কারো কারো মতে তিব্বতের Tamlung Tso হ্রদ থেকে সৃষ্ট); ৩০°২৩′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮২° পূর্ব দ্রাঘিমার ছেদবিন্দু হল সাংপোর উৎসস্থল (Tsangpo = Purifier = বিশোধক)।

ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯০০ কিমি; এর মধ্যে প্রায় ১৭০০ কিমি. তিব্বতে, প্রায় ৮০০ কিমি ভারতে এবং বাকী অংশ বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। তিব্বত থেকে ভারতের অরুণাচলপ্রদেশে ডিহং (বা সিয়াং) নামে প্রবেশ করেছে। ডিহং - এর মাত্র ৩৫ কি.মি. গতিপথে প্রায় ৮ টি খরস্রোতা সৃষ্টি করে নেমে এসেছে। যে নদী তিব্বতে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৪৫০০ - ৩০০০ মিটার উচ্চতা যুক্ত ভূমিরূপের উপর দিয়ে প্রবাহিত তাই আসামের সদিয়ার কাছে মাত্র ১৫০ মিটার উচ্চ ভূভাগ দিয়ে প্রবাহিত। সদিয়ার কাছে ডিহং-এর সঙ্গে ডিবং ও লোহিত নদী মিলিত হয়েছে এবং মিলিত প্রবাহ হল ব্রহ্মপুত্র।

আসামে ভূমির ঢাল বেশ কম, নদীখাত ক্রমশ প্রশস্ততর কোথাও ১০ কি.মি. পর্যন্ত। ডিব্রুগড় ও লখিমপুর জেলার মাঝে নদী দুটি খাতে (উত্তরেরটি খেরখুটিয়া এবং দক্ষিণেরটি ব্রহ্মপুত্র) বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত এবং প্রায় ১০০ কি.মি. চলার পর আবার দুটি মিলিত হয়েছে। এই দুই খাতের মাঝে মাজুলী দ্বীপ (পৃথিবীর বৃহত্তম নদী দ্বীপ ধরা হত; বর্তমানে এশিয়ার বৃহত্তম) অবস্থিত। ষোড়শ শতকের সমাজ সংস্কারক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এই মাজুলী দ্বীপ থেকেই ভিন্নতর বৈষ্ণব ধারার প্রচার শুরু করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম চর্চা ও প্রসারের জন্য গড়ে তোলা 'সত্র' গুলি বিভিন্ন উৎসবে এখনও মিলনক্ষেত্র।

এত প্রশস্ত নদী আবার গুয়াহাটির সরাইঘাটের কাছে যেখানে শিলং মালভূমিকে ক্ষয় করেছে সেখানে মাত্র ১ কি.মি. প্রশস্ত; সরাইঘাট-যেখানে ১৬৭১ সালের মার্চ মাসে ঘটেছিল সরাইঘাটের যুদ্ধ - মোগল ও অসম রাজার মধ্যে এবং মোগলদের তিনজন আমীর সহ প্রায় চার হাজার জন নিহত হয়; মোগলরা পরাজিত হয়। এখানেই ১৯৬২ সালে গড়ে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের উপর প্রথম রেল ও সড়ক সেতু (দোতলা সেতু)।

আসামের ধুবড়ির নিকটে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণবাহিনী হয়ে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে। দেওয়ানগঞ্জের কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে - প্রধান শাখা যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পদ্মার (গঙ্গার প্রধান শাখা) সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে; চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। অপর শাখাটি দক্ষিণ-পূর্বে জামালপুর, ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকার নিকটে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। ১৭৬২ সালের ২রা এপ্রিলের ভূমিকম্পের ফলে দ্বিতীয় শাখাটি গৌণ হয়ে পড়ে। মূল জলধারা যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শুরু করে; কারণ ভূমিকম্পের ফলে উত্তরের জামালপুর থেকে দক্ষিণে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত মধুপুর উচ্চভূমি সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার ক্ষেত্রমান প্রায় ৬,৫১,৩৩৪ বর্গ কি.মি.; গড় জলপ্রবাহ ৬,৮১,৬০০ ঘনফুট/সেকেন্ড এবং সর্বাধিক জলপ্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫,৩১,৫০০ ঘনফুট/সেকেন্ড।

তবে সম্প্রতি Chinese Academy of Sciences - এর অন্তর্গত Institute of Remote Sensing Application - এর গবেষক Liu Shouchuang - এর গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সাংপোর উৎস Angshi হিমবাহ; দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৮৪৮ কি.মি. অববাহিকার ক্ষেত্রমান প্রায় ৭,১২,০৩৫ বর্গ কি.মি.।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ-

১। মানচিত্র রচনার নেপথ্যে — জয়ন্ত কুমার দাস।
২। নদী — দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। কৈলাস ও মানস সরোবর — উ মাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
৪। ভ্রমণ — স্বর্নাক্ষর প্রকাশনী।
৫। যোজনা — তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার।
৬। OXFORD SCHOOL ATLAS
৭। GOOGLE MAPS
৮। MONORAMA – TELL ME WHY RIVERS OF THE WORLD.
৯। EXPLORATION IN TIBET – SWAMI PRANAVANANDA (1939)
১০। WIKI PEDIA – ENCYCLOPEDIA
১১। ENCYCLOPEDIA BRITANICA
১২। ENCYCLOPEDIA ENCARTA

দু-একটি ছোট্ট ঘটনার সংকলন

শক্তিপদ মহাপাত্র (প্রাক্তন শিক্ষক)

স্বাধীনতা লাভের পর আমরা অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসেছি। নানান বিষয়ে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সমস্যামুক্ত হতে পারিনি। সে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। একদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ডঃ শম্ভুনাথ চক্রবর্তী মশাই -এর অফিসে নানা কথাবার্তা চলাকালীন শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমার ছাত্রজীবনের দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। সেগুলি শোনার পর শম্ভুবাবু বলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ঘটনাগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাই আমি যদি কয়েকটি ঘটনার সংকলন করি বিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য তাহলে ভালো হয়। নিজে সারা জীবন শিক্ষকতা নিয়ে কাটিয়েছি, তাই এই সমস্যা আমাকে আমার অবসর জীবনে যথেষ্ট পীড়া দেয়। শরীরটা ভালো না থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক মশাই এর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি নিজে এক মিশনারী কলেজে পড়াশোনা করেছি। তখন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন স্কটল্যান্ডের বিদগ্ধ ব্যক্তি - নাম Harold Gohn Tailor - তৎকালীন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Atomic Physics এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। নিয়মশৃঙ্খলা নিজেরা যেমন মেনে চলতেন, তেমনি ছাত্র ছাত্রীদেরও সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য করতেন। এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

প্রথমেই শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ সম্পর্কে বলে রাখি। কলেজের কার্য - তালিকা অনুযায়ী একটি বিষয়ের ক্লাস শেষ হওয়ার পর অন্য একটি বিষয়ের ক্লাসের - যা ভিন্ন কোন কক্ষে অনুষ্ঠিত হতো - সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের যাওয়া এবং স্থান গ্রহন করে প্রস্তুত থাকার জন্য পাঁচ মিনিটের বিরতি থাকতো। এর ফলে পরবর্তী শ্রেণীর কাজ শুরু ও শেষ হওয়ার মধ্যে কোন অসুবিধে হতো না। কাজেই শ্রেণীর কাজ শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ থাকতো নিস্তব্ধ, শুধু অধ্যাপক বা অধ্যাপিকার কণ্ঠস্বর শোনা যেত। তাই এমন একটি পরিবেশে অন্য কোন শব্দ উত্থিত হলে সেটি সবার কানে যেতে কোন বাধা ছিল না। শ্রেণীকক্ষের এমন পরিবেশে একদিন একটি ঘটনা ঘটলো। আমাদের এক সহপাঠী, যে কলেজে শুধু নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল ছাত্র ছিল, গুনগুন করে রবীন্দ্রসংগীতের একটি কলি গেয়ে ফেলেছিল। অধ্যাপক মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কিছুক্ষণ পর জানতে চাইলেন কোন ছাত্র / ছাত্রী এ কাজ করেছে। ক্লাসের সব ছেলে মেয়ে চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কোন উত্তর পেলেন না তখন অধ্যাপক মহাশয় বলে উঠলেন, "Why are you so morally coward?" প্রশ্নটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই সহপাঠী দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে তার অপরাধ স্বীকার করলো। অধ্যাপক মহাশয় বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন এক উজ্জ্বল ছাত্রের আচরণ এমনটা হতে পারে। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর তিনি বললেন যে বিষয়টা তিনি অধ্যক্ষের গোচরে আনবেন। হলোও ঠিক তাই। পরের দিন অধ্যক্ষ Tailor ঐ সহপাঠীকে তাঁর অফিসে তলব করলেন। তিনি সহপাঠীকে বললেন "I know you are a very very bright student. At the same time you are a very bad boy. I don't want that bad boys should read in my institution, you must take transfer certificate within seven days''. ঐ সহপাঠী অন্য কলেজের ছাত্র হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

মিশনারী শিক্ষাব্রতীদের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য যে কতখানি অকৃত্রিম ও গভীর, ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। নিজেরা যদি নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন তা হলেও তা ধরিয়ে দিলে তাঁরা তা স্বীকার করে নেন এবং সংশোধনও করেন। এমনই আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

আমাদের মিশনারী কলেজে পাঠরত যে সব ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ নম্বর পেতো তারা স্কলারশিপ পাওয়ার অধিকারী। তবে তার জন্য ঐ ছাত্র/ছাত্রীকে Prospectus -এ উল্লেখ করা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন পত্র জমা দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। আমি যখন ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন আমি একদিন আবেদন পত্র নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে অনুমতি নিতে যাই। কিন্তু আবেদন পত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন যে সময়সীমা অতিক্রান্ত ; তিনি কিছু করতে পারবেন না। আমি তাঁকে বললাম যে সময়সীমা অতিক্রান্ত হয় নি। আমি দু'একবার বলার পরেও তিনি কথাটা কানে নিলেন না। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি বলে উঠলেন, "I am helpless, youngman. You may go." মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের অফিস থেকে বেরোলাম। একটু দুরেই দেখি উপাধ্যক্ষ সাহেব দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছেন। আমার মুখের ভাব দেখে উনি বুঝেছিলেন যে একটা কিছু ঘটেছে। ইসারায় উনি নিজের অফিস ঘরে আমায় ডাকলেন। সেখানে উনি সবকিছু জানতে চাইলেন। আমি Prospectus খুলে বললাম যে স্যার সময়সীমা অতিক্রম করেনি অথচ উনি আবেদন পত্র নিলেন না। এরপর আমি বললাম যে মিশনারীদের কাছে লেখাপড়া ছাড়া নিয়মশৃঙ্খলা শিখতে এসেছিলাম। এখন দেখছি আমার ধারনা ভুল। বলেছিলাম "Sir, Law makers are law breakers." কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন যে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। আমার কথাগুলো তিনি হুবহু অধ্যক্ষ সাহেবকে বলেছিলেন। একদিন পর অধ্যক্ষ সাহেবের অফিস থেকে ডাক পেলাম। তিনি বললেন "I am sorry, youngman"- এই বলে তিনি আমার আমার আবেদনপত্র চেয়ে নিয়ে তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন।

মিশনারী শিক্ষাবিদগণ নিজেরা ভুল করলে যেমন অকপটে স্বীকার করেন তেমনি সেই ভুল সংশোধন করতেও পিছপা হন না। শুধু কি তাই? পদাধিকার বলে যে কোন অন্যায় কাজ করা বা অন্যায় কথা বলা যে একধরনের অপরাধমূলক আচরণ এটাও তাঁরা স্বীকার করেন। এই রকম আর একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি।

আমরা যখন স্নাতক শ্রেণীতে ৩য় বর্ষে পড়াশোনা করতাম তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে কোন ছুটি ছিল না। কয়েকজন অধ্যাপক আমাদের পরামর্শ দিলেন যেন আমরা একটা আবেদনপত্র নিয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে চেষ্টা করি। একটি আবেদনপত্র নিয়ে আমরা কয়েকজন অধ্যক্ষ সাহেবের অফিসে যাই। অধ্যক্ষ সাহেব সেটি দেখে সরাসরি নাকচ করলেন। কিন্তু আমরা বারংবার অনুরোধ করায় তিনি বললেন "Why are you insisting on my granting your prayer? I dont know who your Rabindranath Tagore is" কথাটা শোনার পর আমাদের মধ্যে একজনের মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায় "In that case you should quit India." কথাটা শুনে অধ্যক্ষ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটু কষ্টের হাসি হাসলেন। আমরা বুঝলাম যে সেটা হাসি নয়, দুঃখ প্রকাশ করছেন যেন কথাটা বলে তিনি ঠিক কাজ করেননি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ছুটির জন্য আবেদন পত্র মঞ্জুর করলেন। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। নিয়মশৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি মিশনারী ও তৎকালীন অধ্যাপকদের নিষ্ঠা যে কত গভীর তা এ থেকে বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি।

ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের কলেজের 'লাইব্রেরী হলে'। ঘটনাটি বর্ণনা দেওয়ার আগে কলেজ লাইব্রেরী সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। কলেজ লাইব্রেরীটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হেন্‌রী ষ্টিফেন সাহেবের অবদান। এই অকৃতদার অধ্যক্ষ মশাই ভারতে এসে বোধহয় ভারতকে আপন মাতৃভূমির মতই ভেবে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা একাধিক অমূল্যগ্রন্থে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন উল্লেখ গ্রন্থকারের নামের পাশে না করে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন - Prof. Henry Stephen - Fellow, Calcutta University.- তিনি আপনার জীবনে সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কলেজকে এই লাইব্রেরীটি উপহার দিয়ে গিয়েছেন। এহেন এক মহান্ শিক্ষাবিদের স্মরণীয়

অবদানটির উদ্দেশ্য ও সম্মান যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে অধ্যক্ষ Tailor সাহেবের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই ছোট্ট ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে।

একদিন 'লাইব্রেরী হলে' কিছু পড়াশোনা করার পর আমি এবং আমার এক সহপাঠী কোন একটি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা বলছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ কোথা থেকে অধ্যক্ষ সাহেব 'হলে' উপস্থিত হলেন। তারপর Reading Hall এর চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন আলোচনারত দুই সহপাঠীকে। কিন্তু কোন কথা না বলে, কোন ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এলেন আমাদের টেবিলের কাছে। তারপর পাশের টেবিলে রাখা কাঠের স্ট্যাণ্ডটি তুলে নিলেন এটিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "Silence please" আর সেটিকে আমাদের দু'জনের মাঝখানে রেখে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন ঠিক তেমনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে গেলেন। আমরা দু'জনে একে অপরের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উপলব্ধি করলাম যে অধ্যক্ষসাহেব নিজের আবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে লাইব্রেরী 'হলের' বিভিন্ন জায়গায় - টেবিলে, দেওয়ালে এমনকি প্রবেশপথের সামনে বড় বড় করে লেখা যে নির্দেশিকা রয়েছে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। পরম শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে আমরা মাথা নত করে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম ''আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও''- কথাটির অর্থ সেদিন আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলাম।

এই লেখাটি ঘটনাবহুল নয় - সাহিত্য রচনাও নয়, নিছক ঘটনার সংকলন মাত্র। কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনাগুলির ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী তা আমরা নিজেরা জীবনে উপলব্ধি করেছি। স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল এই ঘটনাবলী বর্তমানের ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হচ্ছে সেটি অবসর জীবনে ক্ষেত্রবিশেষ পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। এখনকার শিক্ষার্থীরা যদি এর থেকে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে জীবনের পথে চলতে পারে তাহলে এই সামান্য লেখাটি সার্থক হয়ে উঠবে। মনে সেই আশা পোষণ করে আজকের লেখায় দাঁড়ি টানছি।

জানার কথা

কাচের আবিষ্কার কবে?

প্লাস্টিক এসে কাচের স্থান অনেকখানি দখল করলেও এর গুরুত্ব আজও স্বীকৃত। কাচ সৃষ্টির কৃতিত্ব দেওয়া হয় ফিনিসিয় বণিকদের। বলা হয় প্রাচীনকালে এক দল ফিনিসিয় বণিক সিরিয়ার এক নদীর মোহনায় নোঙর ফেলে। রান্নার জন্য চাই উনুন। উপযুক্ত পাথর খুঁজে না পেয়ে তারা জাহাজ থেকে পণ্য হিসাবে নিয়ে যাওয়া নাইটার-এর চাঙ ব্যবহার করে। রান্নার শেষে তারা লক্ষ্য করে যে আগুনের তাপে নাইটার এর চাঙ বালির সঙ্গে গলে গিয়ে এক রকম স্বচ্ছ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়েছে। শুরু হল কাচের ইতিহাস। ফিনিসিয় বণিকেরা কাচ যোগান দিত ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে। প্রায় ৭০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে নির্মিত কাচের পুঁতি ও তাবিজ পাওয়া গেছে মিশরে। (Tell me Why, Dean, 1991)

Reminiscence

S. K. Mukhejee

(M.B.B.S. (Cal), F.R.C.S. (Eng), F.R.C.S. (Glasgow), F.R.C.S., F.BASK (U.K.), FBOSTA (U.K.), F.R.S.M.(Lond), Senior Consultant Orthopaedic Surgeon, Glasgow (U.K.)

I entered Burdwan Municipal High English School in 1939 at the age of 5. I was admitted to class III. My class teacher was Mauluvi Sahib. I enjoyed my first year in the school and my best friend was Dilip Mazumder, who was first in the class, above me. Mauluvi Sahib was a very strict disciplinarian. Pupils were punished by having to kneel down, standing on the bench or sometimes smacking, which was rather hard. However, I escaped all the punishments. The following year, I was promoted to Class IV. This was the same as the previous year, but we had more time for sports and games - we had one period in the day dedicated to this. My class teacher was Benoy Chaterjee. He was a very nice man and was not as strict as my previous class teacher. However, due to the freedom, I don't think I studied that well. Anyway, at the end of the year, the results were the same - Dilip Mazumder was first, I was second. Class V was uneventful. Our class teacher was Asraf Sahib. He was a very nice man indeed, very polite, and a gentleman. He was very good to the pupils. I remember one incident in particular. My brother and I were walking along a paddy field when the paddies were ripe. We were picking up the rice grains and were trying to eat some fresh rice. Asraf Sahib was walking in the same area, saw us and called us. He gave me some money and asked us to go and buy some peanuts and chalchola. That was very kind of him, and I remember that today. In class V we had to leave our school which was at the same site as it is at present. Because of the war, the school was taken over by ARP Anti-air-raid protection, and was taken over by the army. We moved from our school to an old building beside the present Town School. I remember the name of the building - Coxhead Building. However it was a very old building with huge rooms and very high ceilings. I spent class VI and Class VII in this school.

I remember class VI very well. In this year, Rabindranath Tagore died and we had a condolence ceremony in the school, which was very impressive. Everyone took part and Tagore's images were garlanded with many flowers, and we had the usual speeches. In Class VI, my class teacher was my favourite teacher in the school–his name was Rajen Nag. He was very nice to the pupils and was very popular. I remember one incident at the end of the year, after the examination, when he was distributing the marks to the pupils. We were all going and collecting our results. When my turn came, I went up to his desk and he asked me to come beside him. He showed me the mark, which I thought was quite good. Beside the mark, he wrote in front of me "First", meaning that I stood first in the class, which was very emotional for me - I remember that to date. Class VII and Class VIII were moved from this old building to a building near our old school, called Jiafat Manzil, which subsequently became Banipith School. There was a picture house beside the school called Aruna Cinema. Class VII and class VIII were uneventful. During class VIII we were transferred back to our old school which consisted of the present school building, but only one floor–an old large building in the middle of the ground. We also had football ground in the compound of the school and we had a great time in the school. We all enjoyed our schooldays. We also

had a lot of sporting activities and I remember playing football, cricket and hockey for my school. There was also athletics, although I wasn't very good in the track and field events. There were several friends who were very good and competed in various competitions including district sports, sub division sports etc. I remember playing for my school against RAUC Club at a cricket match. Although we lost, in spite of our young age, we did reasonably well. Our athletic teacher was called Mathurababu. There was also another teacher, Benodi Samanta who was very good at cricket. He played with us as well. During the time of my school days, the whole country was involved in independence movement. I remember going out of school on many occasions on strike flying the tricolour Indian flag and shouting slogans - "Bande Matram" - and also "Inclub Jindabad". At times, our processions were obstructed by police and we had to disperse.

During class IX and X, I remember several teachers who taught us and we were very grateful to them. They were Sarojbabu who taught Bengali, Fakir Chandra Ghosh who taught us maths. Other teachers were Shanti Chatterjee, Amarnath Chatterjee and others. During my time, our headmaster was initially Santosh Kumar Dey and then D. N. Naskar. Mr. Naskar was very very good and he definitely improved the performance of the school in Bengal.Our matriculation examination was held at the end of 1947/ begining of 1948. I think forty of our class sat the examination. Six of us passed in the first division, I was one of them aged 14 years one month. Two of us got first division with stars. Out of the six, one of them - myself - went to study medicine. The other five did various university degrees, although none did medicine or engineering.

My schooldays were very happy - probably the happiest time in my life. I enjoyed my studies as well as my sporting activities. I wasn't very studious but always made up my deficiencies by studying hard, just three months before my examination. My mother was always very supportive. In spite of my laziness, I managed to perform well in examinations, luckily.

I also remember that we did not have a uniform. When at school, we all wore different clothes going to school. The only time we had similar clothes was when we were playing football or hockey matches, when we were given school strips. I remember the tiffin break for, I think, half an hour, when vendors came to the gate of the school and we bought snacks from them. That was an experience.

During my time in the school, the town wasn't congested at all. I think the population of Burdwan town at that time was 40,000. We had no problem walking from home to school. We did not have any other transport to get to school. I remember some of my friends came from distances of several miles from the school but always in time. Things were a little bit difficult during Monsoon because the roads were waterlogged with mud etc. During summer days we had morning school which started at around 7 o'clock until 12.00. We had to get up very early in the morning to attend this school, but made up our lost time with rest by sleeping in the afternoon. At the end of every class here, we had class ending ceremony, when we all subscribed to a fund and with the money we bought presents for our class teacher, who was presented with good food, sweets, presents and flowers. It was a very pleasant experience for all of us.

I am afraid I have to end at this point as it is difficult to remember many things over 70 years since I started school.

Acharya P. C. Roy – The Pioneer of Indian School of Chemistry in India

Atri Mallick
Class - X

That was a marvellous time. In the decade of 1860's India was impregnated with gems like Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mohandas Karam Chand Gandhi, Ashutosh Mukhopadhyay, Lala Lajpat Roy, Sri Nivas Sastri and Acharya Profulla Chandra Roy. Amongst the luminaries we want to remember in this article Acharya P.C. Roy on his lunar birth day of 150. He was born into a Roy family in the village of Raruli in the district of Jessore in undivided Bengal on the 2nd August of 1861 A.D. His father was Harish Chandra Roy and his mother Bhuban Mohini Debi. Profulla Chandra was no doubt a renowned professor of Chemistry, but that was not his real identity. Once he himself said, "I became a chemist by mistake." He became an uncommon venerable leader of the country only for his 'Life outside Test tube'. He was a great patriot also. He was much influenced by the distinguished eloquence of Surendranath Banerjee in Metropolitan College. His national consciousness was also invigorated at the same time. When Profulla Chandra was only twenty-seven years old, he was awarded D.Sc degree from Edinburgh University of Scotland, and returning to his country he became the assistant professor of Chemistry in the Department of Chemistry of Presidency College in 1888. From that time he started his radical search in science. Practically Indian School of Chemistry was commenced at first in India by the earnest effort of Profulla Chandra. He had a group of eligible disciples such as G. C. Ghosh, G. C. Mukherjee, G. C. Roy, Dr. Meghnath Saha. He was very much affectionate towards his disciples. Profulla Chandra invented a compund named **Marcuras Nitrite** ($HgNo_2$). Both Marcuras and the Nitrite are not ever-lasting. So it is impossible to invent permanent compound from them. But Profulla Chandra was successful in his experiment. He became famous in the whole world and he was called the 'Master of Nitrites'. He was also successful in creating **Amonium Nitrite (NH_4NO_2).** Alkyl Amonium Nitrite (RNH_3NO_2), Platinum Iridiam etc. He established 'Indian Chemical Society' and became the president of the society in 1924-26 and 1926-30. For the development of the society his financial help was unlimited. When he was in Presidency College, here searched on the ancient Hindu Chemistry. In this research he was inspired by famous French Scientist **Mosia Barthelo**. He collected antique materials from Tibet, Baneras, Tanjore and in English he wrote a book 'A History of Hindu Chemistry' by name .Profulla Chandra Roy was the father of Chemical Industry in India. He established 'Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works'. He was also attached to Bengal Potteries Limited, Bengal Enamel Works, National Tannery etc. Profulla Chandra wrote 'Life and experiences of a Bengalee Chemist' which is unparalleled for ever. He lived a life of 'plain living and high thinking' in an attic on the top floor of Science College. He lived the life of a happy hermit on his small pension received from Presidency College. In the critical moment of the country whether it is in flood or in any kind of distress, leaving his test tube of the laboratory, the professor scientist stood by the side of the distressed people. Such an example is very rare in history. Though Profulla Chandra stayed in England for a long time, he was a true Bengali in the true sense of the term. He was 'Bajradapi Kathorani Mriduni Kusumadapi'. He also wept for the wretched persons. In one sense it can be said that the heart of Profulla Chandra was like a 'Bengalee Mother'. On this auspicious occasion I take the privilege to pay tribute to the great soul.

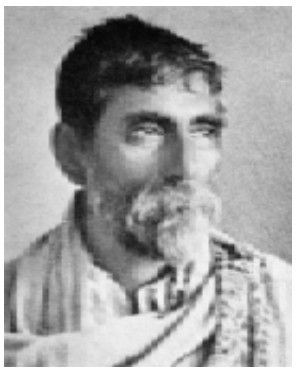

Thank you.

Opportunities and advantages of Low Lactose Milk in Our Daily Life.

Samir Kumar Samanta
Assistant Teacher

Milk is a very important drink. It is the universal food for mamalian newborns. Not only that it is an excellent food for good health. All the constituents reside in milk. They are fat, proteins, lactose, trace elements, vitamins etc. Milk and its derivatives contribute lactose to the diet and its derivatives contribute lactose to the diet.

Life science opines that Lactose is a disaccharide in Milk which consists of two mono saccharides, glucose and galactose joined in a glucoside 1-4β linkage. Lots of opt saying words have enriched the knowledge of Milk and its constituents.

Scarcity of food has been a feature of India's economy for many years past. The current rise in prices of all kinds of foodgrains has hit the poor sections of Indian population very hard. All over the country food riots have taken place. Rationing is in force in large areas. As a result of it, emphasis may be given on the programme of Lactose Milk.

Lactose is fermented by bacteria in the digestive tract. In the intestine it may be absorbed directly. If the lactose intake exceeds the hydrolytic capacity of the available inestinal lactose, then a portion of lactose remains unhydrolysed and is transported to the large intestine. This lactose in large intestive fully in creases the osmolarity of the intestinal fluids and water from the intestinal tissues. Many times it is seen that the bacteria in colon may also ferment lactose and liberate organic acids, CO_2 and H_2. Such and such products and water which are drawn from the intestinal tissues are largely responsible for cetain disorders in human beings. Many experienced men told that the bloating, flatulance, diarrhoea, abdominal pain, loss of appetite, headache etc. are certain disorders and they are felt by human beings. These happen on account of lactose intolerance.

India is a developing country. Here it is reported that the lactose deficiency occurs at all age groups. Again protein deficiency decreases the lactose activity.

From the report of "Hourigan and Mittal", it is known to all of us that the overall prevalence of lactose intolerance in India is about 53 percent and the intolerance will be more in the places where consumption of milk is very less compared to places where more milk is comsumed. Hence the lactose intolerance in Northern India is less (i.e. 7 to 27 percent only) as the people consume significantly more milk and milk products than the people of South India where the lactose intolerance is as high as 61 to 66 percent. In Kolkata (former Calcutta), it is about 80 percent and in Mumbai (formally it was known as Bombay) it is 62 percent.

Now-a-days, the use of low lactose milk for direct consumption and also for the preparation of some products is gaining popularly. Milk is a white fluid produced by female mammals to feed their young. The use of milk-based sweets containing sugar for lactose-deficient persons delays the stomach emptying and as these products are solids, the rate of release of lactose from such products to the small intestine will be much slower than from liquid products.

"Gulati and Deodhar" tells that the net protein utilization and biological value of khoa made from lactose hydrolysed milk are slightly lent significantly higher.

"Gregory" opines that in Ice-Cream preparation the hydrolysis of lactose in the mix allows more reptacement of milk solids not fat with dried whey without the textural problems of sandiness due to lactose crystallisation.

"Thompson and Brower" has a view about the manufacture of cheese. By reducing the lactose content in the milk, the cheddering time reduces and also accelerates the ripening process.

জানার কথা

ঘুড়ির জন্ম কথা ঃ ঘুড়ির জন্ম প্রাচীন কালে। হয়তো ঝরা পাতা, বা বাতাসের বেগে ফুলে ওঠা নৌকার পাল দেখে এর সৃষ্টি। তবে চীনদেশে এর জন্ম একথা স্বীকৃত। চীনের স্যাডং প্রদেশের উইফ্যাং অঞ্চলে মো-জী (৪৭৮-৩৯২ খ্রিঃ পূঃ), এক দার্শনিক প্রথম কাঠের ঘুড়ি নির্মাণ করেন। ঘুড়িকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করেন ২৩০ খ্রিঃ পূঃ হুন সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হানসিন। সম্ভবত হিউয়েন সাঙ এর হাত ধরে ঘুড়ি আসে ভারতে। মোগল সম্রাটেরা ঘুড়ি উড়িয়ে অবসর যাপন করতেন। জনসাধারণের হাতে ঘুড়ি এসে পৌছায় সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়। কলকাতার আকাশে ঘুড়ি ওড়ে অবধের বিতাড়িত সম্রাট ওয়াজেদ আলি শাহ-র হাতে। কলকাতার বাবুরা ঘুড়ির লেজ বানাতেন ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকার নোট লাগিয়ে। ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয় জেলেপাড়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল কাইট অ্যাসোসিয়েশনে বর্তমানে গুজরাটের আমেদাবাদে ১২-১৩ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসব পালিত হয়। বর্ধমান শহরেও এই উৎসব পালিত হয় মহা উৎসাহে।

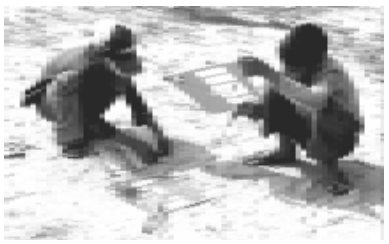

(ঘুড়ির কথা, রবিন পাল, ২০১২)

HIV Drugs : a RAY of Hope

Subrata Ghosh
Assistant Teacher

Ratan (name changed), a native of Kolkata, single and 43 years old, has been working in Bangkok for the last seven years. Suddenly he began to lose weight and complained of loss of appetite. From Christmas 2008, he had a recurrent fever, accompanied with constant diarrhea and absolutely no appetite. The doctors were sure it was ulcer. Coming back at Kolkata with great support from his family members he decided to fly back to Bangkok for further check up. There he went through various tests. He was first diagnosed with acute pneumonia. As soon as the treatment started he began to improve. On Feb, 09 he started his medicines for HIV. His health was improving and he has stopped losing weight.

This is just a fact of what happened to the above mentioned man and from that we are now moving on to the main topic of our discussion of how to prevent AIDS. Human immunodeficiency virus or HIV is a retrovirus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS), a condition in humans in which the immune systems begin to fail. It leads to life-threatening opportunistic infections (Ols). HIV is not an illness and does not lead to AIDS. An HIV infected person can lead a healthy life for several years before he/she develops AIDS. An HIV infected person can lead a healthy life for several years before he/she develops AIDS. It damages the immune system which is measured by a CD4lymphocyte count. If a person who is infected with HIV, has a CD4 counts less than 200/ml, and has one or more of those 'official' Ols, then the person is said to have AIDS. Infection with HIV occurs by the transfer of blood, semen, vaginal fluid, Cowper's fluid or breast milk.

Life Cycle of HIV :

The steps by which HIV infects and kills helper T cells can be viewed in the following figure :

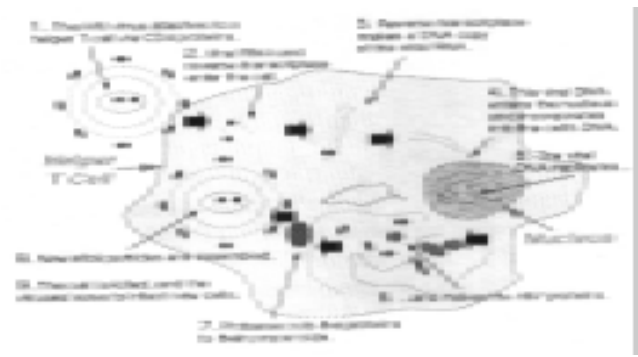

Treatment of HIV :

Doctors often combine various drugs to attack HIV at different stages of its life cycle. This is called "Combination therapy". This is essential since HIV can mutate and can change forms. We will now take up different types of drugs available for HIV treatment and their mode of action.

Entry Inhibitors :

Entry inhibitor is a drug that interferes with HIVs ability to enter a cell. They work by preventing HIV from entering healthy T-cell in the body. The entry inibitors are the newest HIV drugs, T-20 or Fuzeon is one such drug. Lots of drugs are on clinical trial now

and may soon be released.

Reverse Transcriptase Inhibitors :

Reverse transcriptase catalyzes the formation of a DNA copy of the virus's RNA genetic information. Without the reverse transcriptase enzyme, the virus HIV cannot make DNA copies of its genetic material. There are several types of reverse transcriptase inhibitors including nucleoside reverse transcriptase inhibitors, nucleotide reverse transcriptase inhibitors etc. Currently, six drugs that act as inhibitors of reverse transcriptase are on the market for treating HIV-infected patients. We will take here AZT (generic name: Zidovudine, Brand name : Retrovir, Manufacturer : Glaxo Wellcome), a nucleoside reverse transcriptase (RT), that functions as an analog for thymidine, one of the nucleotide building blocks of DNA. This means that AZT has the same shape as thymidine, and therefore, it can be incorporated into the phosphate group attached to thymidine or AZT forms a bond with the 3'-OH group of the preceding nucleotide in the developing DNA chain. When thymidine is incorporated into the DNA chain, its 3'-OH becomes the binding site for the next nucleotide's phosphate group. However, AZT lacks the -OH functional group that is necessary to form a bond with the next nucleotide; in its place is an azido (-N3) group. Because the azido group cannot form a bond with a phosphate group, no additional nucleotides can be added once AZT is incorporated into the DNA chain. Hence, reverse transcription stops after AZT is incorporated.

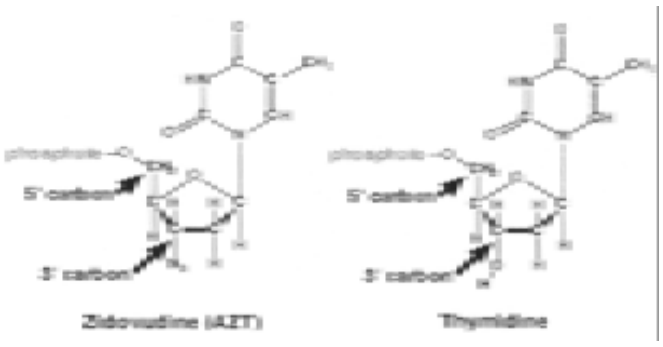

Another example of this category is 3-TC (Generic name : Lamivudin, Brand name : Epiver, Manufacturer : Glaxo Smithkline). This is active against AZT-resistant viruses.The sugar of the nucleoside has been replaced by different heterocyclic ring, which is similar to the sugar in sterochemistry.

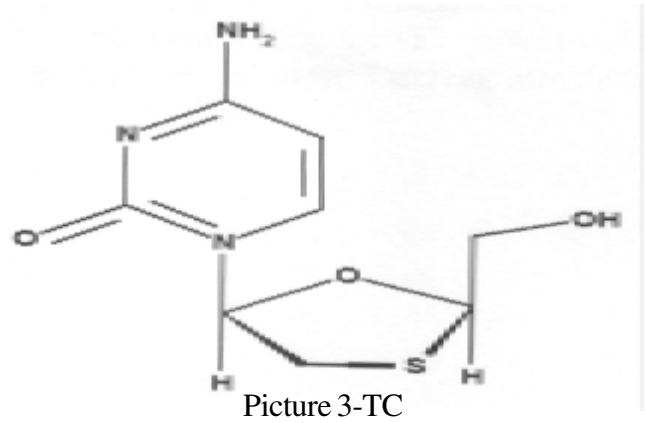

Picture 3-TC

Combivir , a combination drug of Retrovir and Epivir has also found widespread application. The inhibitors described above inhibit our own enzymes and so they are very toxic. Anemia, insomnia, enlargement of liver and build up of lactic acid in the blood are very commonly observed side effects of these inhibitors. A non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor DMP-206 (Generic name : Efavirenz, Brand name Sustiva, Manufacturer, Du Pont and Merck), less toxic to human beings has been produced by Du Pont and Merck. This drug however is not yet FDA approved.

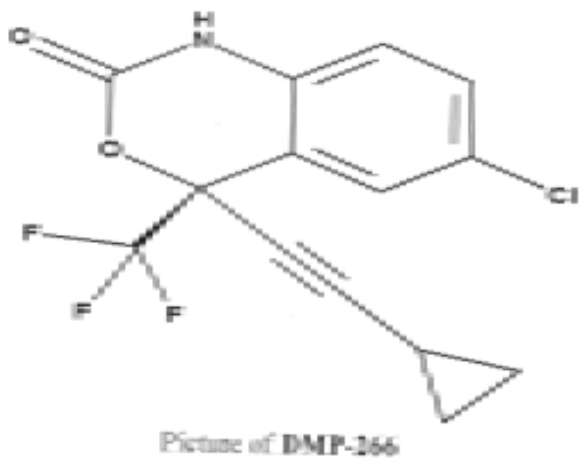

Picture of DMP-266

Integrate Inhibitors :

Integrate inhibitors are oligonucleotides, which are small segments of DNA and RNA that are synthetically prepared. There are no approved integrate inhibitor drugs currently available. But several ones are in trial and may soon be released.

Protease Inhibitors :

In December 1995, the FDA approved a new type of drug for combating HIV. This class of drug acts by inhibiting protease, the enzyme required by HIV to cut its protein into the proper segments to assemble new viral particles. Protease inhibitors, used in combination with two reverse reanscriptase inhibitors, have proven to be quite successful. In 80 to 90 percent of patients, this combination treatment reduces the amount of HIV in the blood to an undetectable level. Protease inhibitors reversibly bind to the protease enzyme and, while bound, prevent the enzyme from cutting the viral protein molecules down to their proper sizes. Crixivan (Generic name : Indinavir, Brand name : Crixivan, Manufacturer : Merck) is one such protease inhibitor.

About a kilo of Crixivan is needed per year to treat each patient.

Norvir (Generic name : Ritonavir, Brand Name : Norvir, Manufacturer : Abott) is yet another example of protease inhibitor.

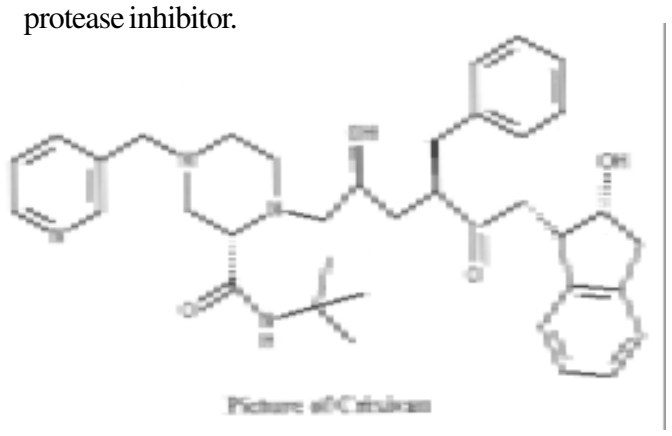

Assemble and Budding Inhibitors :

There are no drugs yet in this category. These drugs are supposed to inhibit the assembly of new virus particles and prevent them from budding out of the CD4 cell.

Conclusion :

Since the discovery of HIV virus in 1984, much research has been conducted and resulted in an increased understanding of the virus, and the development of drugs that have been successful in the treatment (but not cure) of HIV. However, more research is needed in order to effectively combat the global epidemic of HIV. These HIV drugs are expensive. For patients, who are unable to bear these expenses, there is still a ray of hope. They can enter into medication through clinical trials. The patients now will become a subject on whom future HIV drugs will be tested. As such drugs are not FDA approved, certainly a great risk exist there in this experimental treatment. On the other hand, such patients assist in the development of

better HIV drugs and thus serve the mankind indirectly, may be under duress. Early studies have shown that 88% of the patients using DMP-266 in a double combination with the protease inhibitor Crixivan have achieved undetectable HIV viral load and their CD4 counts has also improved. However, never suppose that these drugs described here can cure AIDS or HIV; the only triumph is that these wonder chemicals can let a patient live for a period longer than ever before. This is enough to comprehend why we should live out the general decree "prevention is better that cure".

References :

1. "Good news about AIDS," National Institute for Science Education. The Why Files. 26 March 1998. URL:http://whyfiles.news.wisc.edu/035aids/index.html.

2. Gurex, N and Peitsch, M.C. Electrophoresis, 1997, 18, 2714-2723. (Swiss PDB Viewer) URL : http://spdbv.vital-it.ch/.

3. "La Zidovudina (AZT, ZDV, Retrovir)." National AIDS Treatment Information Project. 1 June 1998. URL : http://www.kff.org/archive/aids_hiv/natip/html/azt.html#A6.

4.Chen, M.S. et al. "Metabolism of 4'-azidothymidine," (1992) J. Biol. Chem. 267, 257-260.

5. Chemistry today.

জানার কথা

চার্লস ডারউইন ও বর্ধমান ঃ 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' খ্যাত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ) জন্মেছিলেন বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামে। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী বাংলার শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের জীবন বিষয়ক একটি উপন্যাস রচনার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কার জেতেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' আখ্যায়িকার জন্য। (এটি পরে বেঙ্গল পেজ্যান্ট লাইফ নামে পরিচিত হয়।) বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে চার্লস ডারউইন ১৮ই এপ্রিল ১৮৮১ তারিখে প্রকাশককে লেখেন - "I see that the Reverend Lal Behari Dey is Editor of the Bengal Magazine and I shall be glad if you would tell him with my compliment how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, this novel, Gobinda Samanta". (Wikipedia)

What is Physics?
Understanding the nature

Aniket Majumder
Class - X

The nature around us is colourful and diverse. It contains phenomena of large varities. The winds, the sands, the waters, the planets, the rainbow, heating of objects on rubbing, the function of a human body, the energy coming from the sun and the nucleus ..... there are a large number of objects and events taking place around us.

Physics is the study of nature and its laws. We expect that all these different events in nature take place according to some basic laws and revealing these laws of nature from the observed events is physics. For example, the orbiting of the moon around the earth, falling of an apple from a tree, tides in a sea on a full moon night can all be explained if we know the Newton's law of gravitation and laws of motion. Physics is concerned with the basic rules which are applicable to all domains of life. Understanding of physics, therefore, leads to applications in many fields including bio and medical sciences.

The great physicist Dr. R. P. Feynman has given a wonderful description of what is "understanding the nature". Suppose we do not know the rules of chess but are allowed to watch the moves of the players. If we watch the game for a long time, we may make out some of the rules. With the knowledge of these rules we may try to understand why a player played a particular move. However, this may be a very difficult task. Even if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. Knowing the basic rules is, however, the minimum requirement if any progress is to be made.

One may guess at a wrong rule by partially watching the game. The experienced player may make use of a rule for the first time get surprised. Because of the new move some of the rule guessed at may prove to be wrong and the observer will frame new rules.

Physics goes the same way. The nature around us is like a big chess game played by nature. The events in the nature are like the moves of the great game. We are allowed to watch the events of nature and guess at the basic rules according to which the events take place.We may come accross new events which do not follow the rules guessed earlier and we may have to declare the old rules inapplicable or wrong and discover new rules.

Since physics is the study of nature, it is real. No one has been given the authority to frame the rules of physics. We only discover the rules that are operating in nature. Aryabhat, Newton, Einstein or Feynman are great physicists because from the observations available at that time, they could guess and frame the laws of physics which explained these observations in a convincing way. But there can be a new phenomenon anyday and if the rules discovered by the great scientists are not able to explain this phenomenon no one will hesitate to change these rules.

So what is Physics?

Ans.- Physics is "understanding the nature".

Can you explain physics shorter than "Understanding the nature"????

If you look deep into the nature, you will understand physics and other things better.....

TEACHING STAFF

SECONDARY + HIGHER SECONDARY

1.	Dr. Sambhunath Chakraborti	M.Sc., B.Ed., Ph.D.	Headmaster
2.	Sri Arunava Chakrabortty	B.A. (H), B.Ed.	Asst. Headmaster
3.	Sri Somenath Mallick	B.Sc. (H), B.Ed.	Asst. Teacher
4.	Sri Samir Kumar Samanta	B.Sc. (H), B.Ed., B.A., M.A. (Triple),	Asst. Teacher
5.	Sri Suvra Vanu Dutta	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
6.	Sri Buddhadeb Saha	B.A., B.Ed.	Asst. Teacher
7.	Sri Sisir Kumar Roy	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
8.	Sri Tarun Kumar Khan	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
9.	Sri Swapan Biswas	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
10.	Sri Soumen Ghosh	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
11.	Sri Deb Prosad Bhattacharyya	M.A., P.G.B.T.	Asst. Teacher
12.	Sri Joydev Kundu	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
13.	Sri Modan Chandra Singh	B.A., B.Ed.	Asst. Teacher
14.	Sri Shyama Prosad Thander	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
15.	Sri Sanjib Chakraborty	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
16.	Sri Partha Bandyopadhyay	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
17.	Sri Monojit Hui	M.Sc., B.Ed. (Sc.)	Asst. Teacher
18.	Sri Kausik Ray	M.Com, B.Ed.	Asst. Teacher
19.	Sri Gopal Chandra Santra	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
20.	Smt. Chandana Chowdhury	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
21.	Sri Ramkrishna Karmakar	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
22.	Sri Sajit Kumar Roy	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
23.	Sri Sukanta Mandal	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
24.	Sri Chinmay Kumar Biswas	M.A., B.Ed., B.Sc. (H)	Asst. Teacher
25.	Sri Avijit Kumar Basu	B.Sc., (H) B.Ed.	Asst. Teacher
26.	Sri Soumen Ganguly	M.A.,B.Ed.	Asst. Teacher
27.	Sri Ranjit Murmu	B.A., B.Ed.	Asst. Teacher
28.	Sri Falguni Mistry	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
29.	Sri Raghunath Ghosh	B.Sc., (H), P.G.B.T.	Asst. Teacher

30.	Smt. Aparna Mondal	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
31.	Smt. Rita Mukherjee	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
32.	Sri Abhijit Ghosh	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
33.	Kazi Md. Abul Hayat	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
34.	Sri Amit Mondal	M.Com, B.Ed.	Asst. Teacher
35.	Sri Budhan Chandra Tudu	B.A.	Asst. Teacher
36.	Sri Utpal Das	M.Sc.,	Asst. Teacher
37.	Smt. Soma Roy	M.Sc.	Asst. Teacher
38.	Smt. Rina Majhi	B.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
39.	Dr. Sanjay Banerjee	MCA, Ph.D.	Asst. Teacher
40.	Smt. Indrani Dutta	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
41.	Sri Sushil Pathak	M.Sc., B.Ed.	Asst. Teacher
42.	Sri Kalyan Kumar Guin	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
43.	Sri Tarun Bagdi	B.Sc. (Hons)	Asst. Teacher
44.	Sri Subrata Ghosh	M.Sc.	Asst. Teacher
45.	Sri Anup Haldar	B.A. B.P.Ed.	Asst. Teacher
46.	Smt. Sudipta Datta	M.Sc.	Asst. Teacher
47.	Sri Rajesh Mallick	M.A., B.Ed.	Asst. Teacher
48.	Sri Suchand Dan	B.Sc. (Hons)	Asst. Teacher
	(3 Posts Vacant)		

LIBRARIAN

1.	Subhamita Batabyal	M.A., M.Lib.

PARA TEACHERS

1.	Smt. Moumita Dutta Roy	M.A.
2.	Sri Subhra Kamal Hazra	M.A., M.Ed.
3.	Smt. Sanghita Mukhopadhyay	M.A. B.Ed.

COMPUTER TEACHER

1.	Sri Sanjoy Mondal	B.Sc. (H) NIIT

NON-TEACHING STAFF

1.	Sri Debabrata Goswami	B.A.	Clerk
2.	Sri Debashis Dutta	B.Sc., DISM	Clerk
3.	Sri Saradindu Pan	H.S.	Clerk
4.	Sri Sambhunath Kolay	VIII	Class-IV
5.	Sri Santosh Kumar Gayen	B.A.	Class-IV
6.	Sri Rabindra Nath Beshra	VIII	Class-IV
7.	Sri Loharam Hazra	VIII	Class-IV

PRIMARY SECTION

1.	Sri Gadadhar Ruz	P.U., Jr. B.T.	Teacher In-Charge
2.	Sri Anath Bandhu Ghosh	B.A., Jr. B.T.	Asst. Teacher
3.	Sri Chanchal Kumar Roy	B.Sc., Jr. B.T.	Asst. Teacher
4.	Sri Sudha Raman Samanta	U.E., Jr. B.T.	Asst. Teacher
5.	Sri Debanjan Mazumdar	B.Com, Jr. B.T.	Asst. Teacher
6.	Smt. Ruma Haldar	B.A. (Hons), P.T.T.I.	Asst. Teacher
7.	Sri Tapas Kumar Pal	B.Sc. (H), B.Ed., M.A.	Asst. Teacher
8.	Sri Tanmoy Pal	M.A. (Eng.), P.T.T.I.	

ACADEMIC COUNCIL

1.	Dr. Sambhunath Chakraborti	President
2.	Sri Arunava Chakrabarti	Secretary
3.	Sri Soumen Ghosh	Asst. Teacher
4.	Sri Utpal Das	Asst. Teacher
5.	Sri Amit Mondal	Asst. Teacher

STAFF COUNCIL

1.	Dr. Sambhunath Chakraborti	President
2.	Smt. Chandana Choudhury	Secretary

MANAGING COMMITTEE

1.	Sri Pradip Acharya	SDO, Sadar (North)	President
2.	Sri Ashish Kumar Sarkar	Guardians' Representative	Vice-President
3.	Sri Thakahari Ghosh	Person Interested in Education	Secretary
4.	Dr. Sambhunath Chakraborti	Headmaster	Joint-Secretary
5.	Sri Ainul Hoque	Chairman, Burdwan Municipality	Member
6.	Dr. Tanushri Saha	Vice-Chairman, Burdwan Municipality	Member
7.	Sri Jagannath Goswami	A.I. of Schools (S.E.)	Departmental Nominee
8.	Sri Taraknath Rudra	Guardians' Representative	Member
9.	Sri Avijit Roy	do	Member
10.	Sri Subrata Kushary	do	Member
11.	Sri Subin Kumar Choudhury	do	Member
12.	Smt. Soma Majumdar	do	Member
13.	Sri Swapan Kumar Biswas	Teachers' Representative	Member
14.	Sri Joydeb Kundu	do	Member
15.	Sri Soumen Ganguly	do	Member
16.	Sri Rabindranath Besra	Non-teaching staff Representative	Member